কালের কথা

জয়নুল আবেদীন আজাদ

কালের কথা

জয়নুল আবেদীন আজাদ

সৃজন প্রকাশনী লিমিটেড

www.pathagar.com

কালের কথা
জয়নুল আবেদীন আজাদ

প্রকাশনায়ঃ
সৃজন প্রকাশনী লিমিটেড
৯৯, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা
ঢাকা–১০০০, বাংলাদেশ

প্রথম প্রকাশঃ
পৌষ ১৪০১
ডিসেম্বর ১৯৯৪

গ্রন্থস্বত্বঃ
রাজিয়া আবেদীন

প্রচ্ছদঃ
হামিদুল ইসলাম

মুদ্রণেঃ
পেপার কনভার্টিং এণ্ড প্যাকেজিং লিমিটেড
৯৯, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা
ঢাকা–১০০০, বাংলাদেশ

মূল্য ঃ ৯০ টাকা

Kaler Kotha
Zainul Abedin Azad
Published by Srijon Prokashoni Limited
Dhaka, Bangladesh.
First Print : December1994
Price : Tk. 90.00 US $ 3.00

www.pathagar.com

'কালের কথা' আসলে আমাদের এই সমাজেরই কথা। কালের কথায় আমি নিজের চোখে দেখা সমাজ–চিত্রগুলো সাদামাটা ভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। আমাদের দেশের সমাজ–চিত্রের সাথে সাথে প্রাসঙ্গিক ভাবে গ্রন্থটিতে দু'চারটি ভিনদেশী সমাজ চিত্রও স্থান পেয়েছে।

১৯৮৪ থেকে ১৯৮৮ সালের জুলাইয়ের মধ্যে রচিত এই গ্রন্থের লেখাগুলো বিভিন্ন সময় পত্রিকার পাতায় মুদ্রিত হয়েছে। পত্রিকায় বিচ্ছিন্নভাবে মুদ্রিত হওয়ায় লেখাগুলো থেকে সমাজ জীবনের মোটামুটি একটি পরিচয় পাওয়াও পাঠকদের জন্য ছিল কষ্টকর। তাই বিভিন্ন সময়ে মুদ্রিত ঐ লেখাগুলো একত্রিত করে পাঠকদের সামনে হাজির করলাম।

জানিনা লেখাগুলো পাঠকদের মনে কিছুমাত্র দোলা দিতে সক্ষম হবে কি না।

লেখক

১৯ আগস্ট ১৯৮৮

www.pathagar.com

ভূমিকা

জয়নুল আবেদীন আজাদকে আমি পেয়েছি আমার সহকর্মী সাংবাদিক, সমাজচিন্তক এবং একজন নিবেদিত প্রাণ তরুণ সাহিত্যিক হিসেবে। তার রচনার গতি ও বিষয়ের বিশ্লেষণ প্রথম থেকেই আমাকে মোহিত করে রেখেছে। শিশু আন্দোলনের সংগঠক হিসেবে তার সাথে আমার একরকম আত্মীয়তার সম্পর্ক। তাছাড়া আজাদের শিশু পত্রিকাদি সম্পাদনার অভিজ্ঞতাও তার রচনায় আঙ্গিক ও ভাষার সারল্য নির্মাণে সহায়ক হয়েছে। নিঃসন্দেহে জয়নুল আবেদীন আজাদ আমাদের সমসাময়িক কালের তরুণ চিন্তাশীল লেখক গোষ্ঠীর অন্যতম।

সম্প্রতি লেখক তার বিভিন্ন সময়ে লেখা বাছাইকরা বত্রিশটি প্রবন্ধ নিয়ে 'কালের কথা' নামক একটি বই প্রকাশের উদ্যোগ নেয়ায় আমি অত্যন্ত আনন্দ বোধ করছি। আগেই বলেছি তার লেখার সাথে আমার পরিচয় দীর্ঘদিনের। 'কালের কথা'য় লেখক সমকালীন ঘটনা প্রবাহের সাথে সঙ্গতি রেখে এই মনোরম পাণ্ডুলিপি তৈরী করেছেন। বইটি যে আমাদের মননশীল পাঠকদের নতুন চিন্তার খোরাক দেবে এতে আমার এতটুকু সন্দেহ নেই। কালের কথার প্রবন্ধগুলো পড়ে আমার মনে হয়েছে, এই লেখকের চিন্তা ও বিশ্লেষণ শক্তির একটা পরিচ্ছন্ন ধারাবাহিকতা আছে। তার আদর্শবাদও স্পষ্ট। তিনি বিশ্বাসী মানুষ। সমাজের প্রতি তার যে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী রয়েছে তা ব্যক্তি মানুষের আলোচনায়ও দরদপূর্ণ বিবরণ হয়ে উঠেছে। এ ধরনের দয়ার্দ্রচিত্ত লেখকগণই শেষ পর্যন্ত চিন্তার ক্ষেত্রে স্থায়ী প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হন। জয়নুল আবেদীন আজাদের রচনাকে এ কারণেই আমি সার্থক এবং আমার জন্য অবশ্য -পাঠ্য বলে বিবেচনা করি।

আল মাহমুদ
৫ সেপ্টেম্বর '৯৩

www.pathagar.com

উৎসর্গ

.....

মা–কে

যার হাতে আমার

লেখাপড়ার

হাতে খড়ি

www.pathagar.com

সূচীপত্র

এক সুজার কাহিনী	❑	১
রোগ– শোক ঃ বাড়ী ভাড়া এবং নিম গাছের ডাল	❑	৬
ক্যালিব, ক্যারন এবং টিন–এজারদের কথা	❑	১১
পিতা–মাতারা কেমন আছেন	❑	১৫
আমাদের জীবন–যাপন	❑	২০
শবেবরাতের পটকা এবং দাদার কথা	❑	২৬
জেনারেশান গ্যাপঃ নাসীরুদ্দীন হোজ্জা এবং	❑	৩০
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধঃ লিটল বয়, ফ্যাটম্যান এবং কাংখিত শান্তি	❑	৩৬
গভীর রাতের টেলিফোন	❑	৪২
বউ ভাড়া আর ফ্যাশান শো'র কথা	❑	৪৭
ফিল্ম–লাইন এবং আলু–পটলের ব্যবসা	❑	৫২
মনের মনিকোঠায় বৈচা–শুঁটকি	❑	৫৬
শপিং সেন্টার ঃ ফিল্ডিং, অডিশন এবং বেচা–কেনা	❑	৫৯
তোফাজ্জল মিয়ার কপালে শেখ সাদীর ভোগান্তি	❑	৬৪
ময়ূরপঙ্খী ভিড়িয়ে দিয়ে সেথা	❑	৬৮
ভিলেনদের জন্য দায়ী কারা	❑	৭২
নিঃসঙ্গতার স্বপ্নভঙ্গ	❑	৭৭
অভ্যর্থনা জানালেন অমিতাভ বচ্চন	❑	৮২
কবিতা ও রাজনীতি এবং হায়রে প্রবন্ধ	❑	৮৭
মহররম ঃ মেলার পিস্তলে শাড়ী পোড়ে	❑	৯১
অবাঞ্ছিত তথ্যপ্রবাহ	❑	৯৫
সাংস্কৃতিক চেরনোবিল	❑	৯৮
শব্দ–পীড়ন	❑	১০২
পরাশক্তির দুঃখ	❑	১০৫
ট্র্যাজেডির নানা কথা	❑	১০৯
বন্যা, পুরস্কার এবং ওয়াংয়ের খবর	❑	১১২
হাসপাতালের সুখ–দুঃখ	❑	১১৫
শিশুদের বেড়ে ওঠার এ কেমন পরিবেশ	❑	১১৯
প্রভু ভক্তির স্বরূপ সন্ধান	❑	১২৩
মুসা নামের ছেলেটি	❑	১২৭
বাবলীর চিঠি	❑	১৩০
জুম্মানের ক্ষুর এবং সমাজপতির দৌড়	❑	১৩৪

www.pathagar.com

কালের কথা

জয়নুল আবেদীন আজাদ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

এক সুজার কথা

আমি যে সুজাকে জানি তিনি কোন রাজপুত্র নন। কোটালপুত্রও নন। এমনকি তিনি নগরের অধিবাসীও নন। রাজপুত্রসুলভ তেমন কিছু না থাকলেও কিন্তু তার গর্ব করার মত একটা শরীর ছিল। যেমনি লম্বা, তেমনি চওড়া। আর খানেওয়ালা হিসেবেও গাঁয়ে তার বেশ নাম-ডাক ছিল। বেচারার শরীরটা এতই হৃষ্ট-পুষ্ট ছিল যে, বিয়ের সময় নাকি সারা শহর চষেও তার পায়ের একজোড়া জুতা যোগাড় করা যায়নি। পরে অবশ্য অর্ডার দিয়ে সে সমস্যার সমাধান করতে হয়েছিল। আজো গ্রামে প্রবাদ-বাক্যের মত এ কথা সবার মুখে মুখে।

সুজার বাবা কিন্তু ঠিক কৃষক ছিলেন না। গ্রামের সবাই 'মুন্সী সাহেব' বলে তাঁকে বেশ সম্মান করতেন। মুন্সী সাহেব আরবী-ফারসী ভালই জানতেন, বাংলা ইংরেজীও মোটামুটি। তাছাড়া তিনি ছিলেন সদালাপী ও সদাচারী ব্যক্তি। গাঁয়ের মক্তবে শুভ্র শ্মশ্রুমণ্ডিত দীর্ঘদেহী এই মুন্সী সাহেবের কদর ছিল দারুণ। তাই চাষবাস না করেও তাঁর সংসার চলছিল ভালই। কিন্তু সুসময় তো মানুষের জীবনে আর চিরদিন থাকে না।

উপমহাদেশের রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনের দোলা এসে লাগল গ্রামেও। আরবী-ফার্সীর বদলে ইংরেজীর কদর বাড়তে লাগল শনৈঃ শনৈঃ করে। মক্তবের বদলে তখন গ্রামে গ্রামে উঠতে লাগলো নতুন নতুন স্কুল। ছেলেপিলেরা ভিড় জমাতে লাগলো সে সব স্কুলে। গ্রামে মক্তবের আর তেমন কদর রইলো না। মুন্সী সাহেবের প্রাতিষ্ঠানিক তেমন কোন সার্টিফিকেট না থাকায় তিনি কোন স্কুলেও ঢুকে যেতে পারলেন না। অতএব মুন্সী সাহেবকে তখন ভাগ্যান্বেষণে চলে যেতে হল শিক্ষা-দীক্ষায় অনগ্রসর উত্তর বঙ্গের দিকে।

www.pathagar.com

অন্ন যোগাড় করতে গিয়ে পরিবারের সাথে মুন্সী সাহেবের যোগাযোগের মাত্রা নেমে আসলো হিমাঙ্কে। এ অবস্থায় ছেলেপিলেদের কেউই স্বাধীনভাবে চলার সুযোগ নিতে কার্পণ্য করলো না। গ্রামের আচার-অনুষ্ঠান, এটাসেটায় তাদের দারুণ মাথাব্যথা ছিল, কিন্তু লেখা-পড়ায় অগ্রসর হওয়ার ব্যাপারে তাদের ছিল না তেমন বেগন আগ্রহ।

ফলাফল যা হবার তাই হল। ছেলেদের বয়স বাড়লো এবং তারা বিয়ে করে স ংসারী হলো। সংসার কাঁধে আসলে বোধ হয় মানুষের বহে-মিয়ান ভাবটা কিছুটা কেটে যায়। তাই মুন্সী সাহেবের ছেলেদের কেউ কেউ কৃষিকাজে মন দিলেন, কেউবা আরো একটু উদ্যোগী হয়ে শহরে গেলেন চাকুরী করতে। কিন্তু মুন্সী সাহেবের কনিষ্ঠ সন্তান সুজা কিছুই করলেন না। না বিয়ে, না কৃষি, না চাকুরী—কিছুই না। সফেদ লুঙ্গি পড়ে হাটে বাজারে আড্ডা দিয়ে আর খাওয়ার প্রতিযোগিতায় নামকিনে কিনে সুজা সাহেবের সময়টা ভালই কাটছিলো। কিন্তু এভাবে কি কারো কাল কাটে? আর বিনা কাজের কাজীকে কেই বা ভালবাসে। ভাবীরা ভাইদের বুদ্ধি দিল: সুজাকে এবার বিয়ে করাও, তাহলে দেখবে সে ঠিকই সংসারী হবে।

বুদ্ধি অনুযায়ী কাজ হল। বিয়ে হল ঠিকই কিন্তু সুজা তো আর সংসারী হল না। বিয়ের পর তার ফুর্তির জৌলুস যেন আরো বেড়ে গেল। ভাইরা বললেনঃ এভাবে তো আর সংসার চলে না, কিছু কাজটাজ কর। সুজা বলেন, কি কাজ করবো? ভাইরা বলেনঃ লেখাপড়া তো তেমন করনি যে শহরে গিয়ে চাকরী করবে। অগত্যা চাষাবাদেই মন দাও। সুজা বলেনঃ কাঁচির রোয়া যেদিন উল্টোভাবে কাটা হবে সেদিন তোমরা আমাকে কৃষি কাজে মাঠে পাবে। অর্থাৎ সোজা উত্তরঃ কাঁচির রোয়াও কোন দিন উল্টোভাবে কাটা হবে না, আর উনিও কোন দিন কৃষি কাজে মাঠে নামবেন না। এ যেন সুজার রাজোচিত এক জাত্যাভিমান! কিন্তু সংসার তো আর জাত্যা-ভিমানকে বন্দনা করে চলে না, সে চলে আপন নিয়মেই। সংসারের সংঘাতে মুন্সী সাহেবের যৌথ পরিবার ভেঙ্গে হল বহুধা বিভক্ত। ছেলেরা আলাদা আলাদা হয়ে গড়তে চাইলো আপন সংসার।

সংসারের এ ভাঙনে সুজা যেন কিছুটা সম্বিত ফিরে পেলেন। কিন্তু তখন বেশ দেরী হয়ে গেছে। ভাগে যা জমি পেয়েছেন তাতে তার সংসার চলে না। কাজে কর্মে অপটু সুজার মাথায় তখন যেন বাজ ভেঙ্গে পড়লো।

www.pathagar.com

সফেদ লুঙ্গিধারী ব্যক্তিটি গামছা লুঙ্গি ধারণ করে উদয়াস্ত খেটেও পরিবারের ভরণ-পোষণ করতে পারেন না। দিনে দিনে সংসারের বলেবর বৃদ্ধি হলেও তার আয়ের আয়তন আর বাড়লো না।

জীবনযুদ্ধে কুপোকাত সুজা এক সময় হাত দিল জমিতে। সমর্থ ভাই-দের কেউ কেউ নতুন স্বপ্নে বিভোর হয়ে কিনে নিল সে জমি।

সুজা এখন ক্ষেত-মজুর। গতরই এখন তার সম্পদ, গতরই এখন তার পুঁজি। গতর খেটে তো পেটের আগুনই নেভানো যায় না, সেখানে স্ত্রী-কন্যার কাপড় যোগাবে সে কোত্থেকে। ফলে শাড়ীতে তাদের তালি পড়ে একাকার।

সুজার আয় না বাড়লেও তার মেয়ের বয়স বেড়ে যায়। কিন্তু মেয়েরযে বিয়ে দিবে সে সামর্থ তো সে রাখে না। আর ভাইয়েরা? তারা তো সবাই এখন নিজ নিজ সংসার পরিক্রমায় দারুণভাবে ব্যস্ত। এদিকে দৃষ্টি দেবে সে সময় কোথায়।

সংকটের সংসারে মেয়েরা যেন তাড়াতাড়ি ডাগর হয়ে যায়। তাই সোমত্ত মেয়ের একটা বিহিত করার জন্য সুজার সাথে সাথে আর পাঁচ-জনের চোখেও যেন ঘুম নেই। কিন্তু বলাই বাহুল্য, এইপাঁচজনের হাহুতাশে কথার ফানুস উড়লেও বাস্তবের একটি পাতাও নড়ে না।তাই সুজাদের এই অসহায়ত্বের সুযোগ নিল গাঁয়েরই এক যুবক। মেয়েটির সাথে সে মন দেয়া নেয়া করল। বিয়ে করবে বলে কথা দিল। দিন যায়, বছর যায় কিন্তু ছেলে আর শহরে থেকে ফিরে আসে না। এদিকে মেয়েটি দিন দিন কেমন যেন উন্মনা হয়ে উঠলো। অবশেষে হলো ক্ষ্যাপা। ছেলেটির ঠিকানা নিয়ে সে রওয়ানা হল শহরে। মেয়েটি কি জানে, আলো ঝলমল এই শহরের বুকে বাস করে কত অন্ধকার? গুলিস্তানে নেমেই সে ধরা পড়ে গেল জহুরী-দের চোখে। জহুরীদের একজন ঠিকানায় পৌঁছে দেবে বলে মেয়েটিকে নিয়ে উঠলো এক রিক্সায়। রিক্সার ভিতরের কথোপকথন ও হাবভাবে রিক্সাওয়ালার কেমন যেন সন্দেহ হল। এক জায়গায় রিক্সা থামিয়ে সে ব্যাপারটা একটু খতিয়ে দেখতে চাইলো। গরমিল ধরা পড়লো। জহুরীর সাথে অনেক ধস্তাধস্তির পর সে মেয়েটিকে উদ্ধারকরে নিজ বাসায় নিয়ে এল মা'র কাছে। রিক্সাওয়ালার নাগরিক সচেতনতা এ যাত্রা মেয়েটিকে রক্ষা করতে সমর্থ হল।

www.pathagar.com

এদিকে সারা গাঁয়ে মেয়ের কোন খোঁজ না পেয়ে সুজা উদভ্রান্তের মত ছুটে এল লঞ্চ ঘাটে। লঞ্চ ঘাটে এসে খবর পেল মেয়ে সকালেই লঞ্চে উঠেছে। আর এই খবরের সাথে বাড়তি পেল ঘাটের নানা জনের নানা উপদেশ আর গঞ্জনা।

সুজা এখন এসবে আর গা করে না। সে ধীর পদবিক্ষেপে ক্লান্ত দেহটা টেনে টেনে বাড়ী ফিরল। কারো কাছে কোন সাহায্য চাইলো না, কারো বিরুদ্ধে কোন অনুযোগও করল না। পৃথিবীর কারো কাছে তার যেন চাওয়ার আর কিছুই নেই।

সুজাকে দেখলে এখন মনে হয় সে যেন হৃদয়হীন একটি রোবট। সারাদিন আপন মনে কাজ করে, গতর খাটে। সন্ধ্যা হলে মুখে দু'টো দিয়ে শুয়ে পড়ে। আশ্চর্য রকম শীতল হয়ে গেছে এক সময়ের দুরন্ত সে সুজা। গ্রামের মেল-সমাজেরও আর তেমন ধার ধারে না সে। তাই যখন তার মেয়ে সেই রিক্সাওয়ালা মানুষটিকে বিয়ে করে গ্রামে গিয়ে উঠলো, তখন এক বোবা অভ্যর্থনায় সে তাদের ঘরে নিয়ে তুললো। গাঁয়ের দশজন কি বলবে না বলবে তার কোন তোয়াক্কাই সে করলোনা। কুড়ে ঘরটার মাঝখানে পাটখড়ির পার্টিশন করে দিল মেয়ে আর জামাইকে থাকার জন্য।

সুজা যেন নিজের চলার জন্য নিজেই একটা সংবিধান তৈরী করে নিয়েছে। কোন ব্যাপারেই চলতে এখন তার পা কাঁপেনা। তাই যখন বড় ভাই বাড়ীতে পাকা পায়খানা করার জন্য নদী তীর থেকে ইট বয়ে আনতে তাকে মজুর খাটতে বলে, সে তখন রাজী হয়ে যায়। অবশ্য এ নিয়ে পরে সে সর্দারকে অভিযোগ করে বলেঃ কি আকামা সর্দার হইলা তুমি, আজকাল কি এত কম রেটে কেউ ইটের বোঝা বয়। এ প্রশ্নে সর্দার কেমন যেন ভড়কে যায়। সর্দার ভাবেঃ নিজ বাড়ীর পাকা পায়খানার ইট বইতে কেউ মজুরী নেয় নাকি, তার উপর মজুরীর রেট নিয়ে উল্টো প্রশ্ন? সুজাটা যেন কেমন হয়ে যাচ্ছে দিন দিন!

সে দিন হাটেও এক কাণ্ড করে বসলো সুজা। হাটের বদলে বাড়ী থেকে মজুরী নিতে বলায় সে ক্ষেপে উঠলো বড় ভাইয়ের উপর। চিৎকার করে সে বললঃ আপনার বাজারটা একটু ছোট কইরা করলে হইতো না। বাড়ীতে গিয়া আপনার টাকা দিয়া আমি কি কচু করমু। বাজার থিকা চাইল ডাইল না নিলে আমার ঘরে তো সব উপাস রইবো।

www.pathagar.com

ভরা হাটে সুজার কথায় সেদিন বড় ভাই দারুণ রুষ্ট হয়ে ছিলেন। কিন্তু সেদিকে সুজার কোন খেয়ালই ছিল না।

শুধু কি তাই? প্রয়োজনের তাগিদে সুজা এখন বাড়ীর পয়স্তি কিংবা পুকুরের আইলের শরীক গাছ কেটে ফেলতে দ্বিধা করে না। এতে বাড়ী ধসে যাক বা আইল ভেঙ্গে পড়ুক-সে তোয়াক্কা সে করে না। তার কাছে এখন বর্তমানের প্রয়োজনটাই সবচেয়ে বড় কথা। ভবিষ্যৎ তার কাছে শূন্য খাতা। তার এসব কর্মকাণ্ড নিয়ে কথা হয়, বিচার হয়—কিন্তু তাতে কোন ফল হয় না।

সুজার বর্তমান কর্মকাণ্ড দেখে আমার সেই নৌ-যানের উদাহরণটাই মনে পড়ছে। নৌ-যানটির উপর নীচ উভয় তলাই ছিল যাত্রীতে ভরপুর। এক সময় নীচ তলার যাত্রীদের পানির প্রয়োজন হল। কিন্তু পানির ব্যবস্থা ছিল উপর তলায়। নীচ তলার যাত্রীরা উপরে এসে পানি নিক সেটা উপর ওয়ালাদের কাম্য নয়। তখন অগত্যা নীচ তলার যাত্রীরা পানির জন্য কুড়াল নিয়ে নৌ-যানটির তলা ফাড়তে উদ্যত হল। এতক্ষণে উপর ওয়ালাদের টনক নড়ল। সামগ্রিক ধ্বংস থেকে বাঁচার জন্য তখন তারা সানন্দেই নীচের লোকদের পানি দিতে রাজী হল।

অবস্থা দৃষ্টে মনে হচ্ছে, সুজা এখন পানির অন্বেষণে কুড়ালহস্ত হয়েছে। কিন্তু শুধু কি এক সুজাই এখন কুড়াল-হস্ত? শহরে-বন্দরে গ্রামে হাজারো সুজা কি এখন কুড়াল-হস্ত হয়নি? এদের সংখ্যা কি একক, দশক, শতক, সহস্র করে দিন দিন বেড়ে উঠছে না?

উপর ওয়ালারা চিন্তা করে দেখুন, আপনারা কি তাদের পানির প্রয়োজন মিটাবেন না নৌকা শুদ্ধ ডুবে মরবেন।

রচনাকাল: ২৬মে ১৯৮৫

www.pathagar.com

রোগ-শোক ঃ বাড়ী ভাড়া এবং নিম গাছের ডাল

বাসাটায় তখনও শোকের পরিবেশ। ড্রইংরুমে ঢুকে দেখলাম বাসার ছোট্ট মেয়েটি সোফায় ঘুমিয়ে আছে। ক্লান্ত শ্রান্ত মুখ, যেন দেখার কেউ নেই। বাসায় বেশ কয়েকটা কক্ষ থাকলেও কোথাও কোন আওয়াজ নেই। সব সুমসাম। বাড়ীর বড় কর্তার মৃত্যু সমস্ত বাড়ীটার চেহারাই কেমন বদলে দিয়েছে। প্রাণবন্ত এই পরিবারটি যেন প্রচণ্ড এক ঝড়ের আঘাতে সর্বস্বান্ত হয়ে গেছে।

ড্রইংরুমে একা একা বসে ভাব ছিলাম ঃ এই পরিবারটি তো কখনো এমন নীরব-নিথর ছিল না। শিশু সংগঠনের একজন কর্মকর্তা হিসেবে এ পরিবারে আমি আরো অনেকবার এসেছি। পরিবারের বড় ছেলেটি একজন চটপটে কর্মী ছিল। ওর হাস্যোজ্জ্বল চেহারাটার মতই ছিল পরিবারটির মুখ। অথচ একটি ঘটনাই সব কিছু কেমন বদলে দিল! মৃত্যু কি এতই শক্তিমান। অভ্যস্ত অব্যাহত জীবন কি তার মুখোমুখি হয়ে থমকে দাঁড়ায়? জীবন কি আবার জীবনের অর্থ খুঁজে পেতে ধ্যানস্থ হয়?

আমার চিন্তার প্রবাহটি আর বেশী দূরে এগুতে পারল না। পরিবারটির জনৈক সদস্য ড্রইংরুমে ঢুকে কুশল বিনিময় করলেন। তার আহবানেই আমার এবার আসা। তিনি বলেছিলেন ঃ গালিবদের দেখে যাবেন এবং বাসাটাও দেখে নেবেন। দাদার মৃত্যুর পর গালিবদের পক্ষে আর এত বড় বাসাটার ভাড়া গোণা সম্ভব হবে না।

তখনই কথাটা আমার মনের তন্ত্রীতে কেমন যেন একটু বেজেছিল। একটি শোকগ্রস্ত পরিবারকে দেখতে যাওয়ার সাথে সাথে আবার বাসা ভাড়ার খোঁজ নেওয়া। তবুও বাসার নিদারুণ সংকটে আমি ভদ্রলোকের প্রস্তাবিত দু'টি বাসনা নিয়েই যথাসময়ে সে বাসায় হাজির হলাম। একেই বোধহয় বলে বাস্তবতা। বাস্তবতার হাতুড়ী-পেটায় এভাবেই মানব মনের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলো হার মেনে যায়।

ভদ্রলোক ড্রইংরুমে আসার কিছুক্ষণ পরেই বাড়ীর গৃহকর্ত্রী প্রবেশ

www.pathagar.com

করলেন। তাকে দেখেই আমি কেমন যেন ঘাবড়ে গেলাম। একটি সাদা চাদরে তার সারা শরীর আচ্ছাদিত, যেন শোকের এক মূর্তিমান প্রতীক। এ অবস্থায় কি কারো সাথে বাসা নিয়ে আলাপ করা যায়। আমার অন্তর্জগত তখন হাড়ে হাড়ে এ ভুলের মাসুল দিয়ে যাচ্ছিল। পরিবারের এটাসেটা নিয়ে অনেক কথা বললেও কিন্তু বাসা ভাড়া প্রসঙ্গে আমার মুখ দিয়ে একটি কথাও বেরুল না। বাস্তবতা তখন মনের সূক্ষ্ম অনুভূতির কাছে হার মেনে গেল। কিন্তু এক সময় গৃহকর্ত্রী নিজেই বললেনঃ একটু ঘুরে-ফিরে দেখুন না বাসাটা পছন্দ হয় কি না। আমরাতো এ মাসেই এ বাসাটা ছেড়ে দেবো। দেখছি কাছে-পিছে একটা ছোট্ট বাসা পাওয়া যায় কি না।

ভদ্রলোক বোধহয় আগেই গৃহকর্ত্রীর কাছে বাসা ভাড়ার প্রসঙ্গটি তুলে ছিলেন। তাই এখন লজ্জায় ম্রিয়মাণ হয়ে কোন রকমে বাসার কক্ষ কয়টিতে একটু চোখ বুলিয়ে দেখলাম। বাসা পছন্দ হয়েছে।

আমরা কক্ষ কয়টিতে চোখ বুলিয়ে আবার ড্রইংরুমে এসে বসতেই কে যেন এসে বললোঃ 'বাইরে দু'জন লোক অপেক্ষা করছে।' আগন্তুকদের ভিতরে নিয়ে আসতে বলা হল। দেখেই বোঝা গেল তারা মফস্বল থেকে এসেছেন। কিন্তু তাদের হাতে এ অসময়ে মিষ্টির হাঁড়ি ও ফল-পাকুড় দেখে একটু অবাক হলাম। আরো অবাক হলাম আগন্তুকদের কণ্ঠস্বর শুনে। দিব্যি বোঝা যাচ্ছিল তারা চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলের লোক। এদের সাথে তো গৃহকর্ত্রীদের কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকার কথা নয়। যখন জানলাম, আগন্তুকরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী, তখন ব্যাপারটা আমার কাছে আরো তালগোল পাকিয়ে গেল।

গৃহকর্ত্রী মিষ্টির হাঁড়ি ও ফল-পাকুড় দেখে বললেনঃ 'এ সব কেন এনেছেন।' বৃদ্ধ বৌদ্ধ ভদ্রলোক বিনীতভাবে বললেনঃ আপনি ব্যাপারটাকে অন্যভাবে নেবেন না। আপনারা যা করেছেন তা ছিল আমার কাছে অবশ্যনীয়। আপনাদের মহানুভবতার কোন মূল্য দেয়া যায় না। আমি যা কিছু এনেছি তা শুধু ভালবাসার তাগিদে। আপনি জিনিসগুলো গ্রহণ না করলে আমি খুব দুঃখ পাব।

আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলাম না। তাই আমার প্রশ্নবোধক চেহারা দেখে বৌদ্ধ ভদ্রলোক বললেনঃ ইনাদের মহানুভবতার জন্য আমার ছেলেটি এযাত্রা বেঁচে গেল। আমার ছেলে 'লিভার সিরোসিস'-এ আক্রান্ত

www.pathagar.com

হয়ে ক্লিনিকে মুমূর্ষু অবস্থায় ছিল। ছেলের রক্তক্ষরণ বন্ধ ও অপারেশনের জন্য বিশেষ ধরনের একটি বেলুনের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সে বেলুন তো মহার্ঘ বস্তু।এদেশে পাওয়া যায় না, আর তার মূল্যও বেশ চড়া। কিন্তু চড়া মূল্য যোগাড় করলেও সেই অসময়ে বিলেত থেকে সে বেলুন আনা তো আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। ডাক্তার বললেনঃ এক ভদ্র মহিলার কাছে সে বেলুনটি আছে। আমি ফোন করে দেখি, তিনি তা বেচবেন কিনা। ডাক্তার ফোন করার পর দেখলাম ভদ্র মহিলা নিজেই বেলুনটি নিয়ে হাজির হলেন ক্লিনিকে। তাঁর কাছে বেলুনের দাম জানতে চাইলে তিনি মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে বললেনঃ আমি তো বেলুনটি বেচতে এখানে আসিনি। আমি তো এসেছি একজন মুমূর্ষু রোগীর সেবা করতে। আমার স্বামীও তো এই 'লিভার সিরোসিসে'ই মারা গেছেন। তার অব্যবহৃত আরো ঔষধ আছে আমার কাছে, প্রয়োজন হলে তাও আপনারা নিতে পারেন।

বৌদ্ধ ভদ্রলোক ভাবাবেগে আপ্লুত হয়ে আরো বললেনঃ এই বৃদ্ধ বয়সে মানুষ তো আর কম দেখিনি। আর আজকাল শহরবাসীদের সাথে কথা বলতেও ভয় করে। সবাই যেন কেমন পাষাণ হয়ে গেছে। তাদের কাছে কোন সহানুভূতির আশা আমার ছিল না। কিন্তু আমার চরম দুর্যোগের সময় এই দুষ্প্রাপ্য বস্তুটি যে এমন সহানুভূতির আকারে পেয়ে যাব, তা আমি কখনো কল্পনাও করিনি।

বৃদ্ধের ছল ছল চক্ষু আর ভালবাসার ভাবাবেগ দেখে আমার তখন মনে হলোঃ মানুষ তো মানবতার ভিত্তি ভূমিতে কত সহজেইএমন আপন হয়ে যেতে পারে। সেখানে তো কোন বিভেদের দেয়াল থাকে না।মুসলমানদের সোনালী দিনের ইতিহাসে তো এমন বহু ঘটনার নজির পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে ক্রুসেড যুদ্ধে রোগে জর্জরিত মুমূর্ষু রিচার্ডের প্রতি গাজী সালাহউদ্দীনের মহানুভবতার ঘটনাটি মনে পড়লো।

সে যাক, যে বেলুন নিয়ে এত কথা, সে বেলুনের নাটকীয় প্রাপ্তির পেছনের ঘটনা কিছুটা করুণ বৈকি। মুমূর্ষু গৃহকর্তাকে বাঁচাবার জন্য অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে বেলুনটি আনা হয়েছিল বিলেত থেকে। এবার অপারেশন করা যাবে। আর অপারেশন হয়ে গেলে মানুষটিও বোধহয় বেঁচে যাবে। কিন্তু দুর্ভাগ্য আর কাকে বলে! অপারেশনের আগের দিনই গৃহকর্তা মারা গেলেন। বেলুনটি আর তার কোন কাজে আসলো না।

www.pathagar.com

ভিনদেশ থেকে আনা সে বেলুন বাঁচালো ভিন গ্রামের এক ভিন মানুষকে। কিন্তু সে ভিন মানুষ তো এখন আর ভিন নেই। মানবতার বেলাভূমিতে সেও এখন হয়ে উঠেছে আপন জন।

বৌদ্ধ ভদ্রলোক এক সময় বিদায় নিলেন। আমিও উঠবো, এমন সময় গৃহকর্ত্রী বললেনঃ একটু বসুন, আমি বাড়ীওয়ালার ভাইকে খবর দেই। বাড়ীওয়ালার অবর্তমানে উনিই সব দেখা-শোনা করেন। ওনার সাথে একটু আলাপ করে গেলে ভাল হবে।

ভদ্রলোক এলেন। আলাপ শুরু হলো। ভদ্রলোক বেশ মজলিসী। আলাপ যেন আর শেষ হয় না। আমার ওঠার ভাব দেখে ভদ্রলোক বললেন, আরে বসুন, আপনারা সাংবাদিক মানুষ তাই এত কথা বলা।

আচ্ছা বলুনতো, আমাদের সমাজটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। ন্যায় নীতি বলতে যেন আর কিছুই থাকবে না। মূল্যবোধের যেন ধস নেমেছে। সেদিনের ঘটনাটাই একটু শুনুন না। ঐ যে বাড়ীটা দেখছেন, ঐটা আমার এক ভায়ের। উনি ঢাকার বাইরে থাকাতে বাড়ীর দেখাশোনা আমাকেই করতে হয়। সে দিন প্রতিবেশী এক কিশোর ঐসে ঐ বাড়ীটির উপর যে নিম গাছটি দেখছেন তার একটা ডাল চাইলো দাঁত মাজবে বলে। আমি অনুমতি দিলাম। ছেলেটি সীমানার দেয়ালে উঠল ডাল ভাংবে বলে। কিন্তু তখনই বাসার কর্ত্রী এসে বাদ সাধলো এবং ছেলেটির বুকে দিল বাঁশের এক ধাক্কা। ছেলেটি পড়ে গিয়ে আঘাত পেল। আমি ছেলেটির সাথে এই অমানবিক আচরণের কারণ জানতে চাইলে তিনি আমার 'অথরিটি' চ্যালেঞ্জ করলেন। বললেনঃ 'আপনি তো এ বাড়ীর মালিক নন। আপনি ডাল ভাঙ্গার অনুমতি দেবার কে?' এক কথায় দু'কথায় ভদ্র মহিলা আমাকে শাসিয়ে বললেনঃ 'পাবনার মেয়ে আমি তোমাকে দেখে নেবো।' ভদ্র মহিলা ঠিকই দেখে নেয়ার যোগাড় করলেন। নিজের কিশোর ছেলেকে দিয়ে পাড়ার ৮/১০ জন বখাটে ছেলেকে হাত করলেন আমাকে শায়েস্তা করার জন্য। ছেলেগুলো সিগারেট ফুঁকে ফুঁকে বাড়ীর ভিতর ঢুকে নাম ধরে খোঁজ করতে লাগলো আমাকে। আমাকে না পেয়ে তারা এখানে-সেখানে জটলা পাকাতে লাগলো। রাতে তারাবী নামায শেষে বাড়ী ফিরতে গিয়ে দেখি বখাটেরা পরীবাগের ব্রীজটি ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। ভাবলাম, অপরিণামদর্শী ছেলেগুলোতো এ মুহূর্তে কিছু একটা অঘটন ঘটিয়ে ফেলতে পারে।

www.pathagar.com

ঠিক তখনই দেখলাম, আমার পাশ দিয় টহলদার পুলিশরা হেঁটে যাচ্ছে। তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললাম, আপনাদের টহলের দৃষ্টিতে কি ঐ ছোকরারা পড়ছে না। পুলিশরা একটু থতমত করে বললোঃ 'আচ্ছা দেখছি ব্যাপারটা'। পুলিশরা ঐ দিকে একটু এগুতেই ছেলেগুলো সুড়সুড় করে কেটে পড়লো। এ যাত্রাতো নির্বিঘ্নে বাড়ী ফিরলাম।কিন্তু ব্যাপারটা আমাকে ভাবিয়ে তুললো। বাড়ীর মহিলারাও ছোকরাদের হাঁকডাকে চিন্তিত হয়ে উঠলো। আমি বিষয়টির সুরাহায় যখন আইনের আশ্রয় নিতে চাইলাম, বাড়ির মহিলারা কিন্তু তখন নিল অন্য পদক্ষেপ। ওরা বখাটে ছেলে-গুলোকে ডেকে আনলো বাড়ীতে। মাতৃস্নেহে বসালো নিজেদের কাছে। জানতে চাইলোঃ তোমরা এমন করছো কেন? ওরা কোন জবাব দিতে পারেনি। বরং মাথা পেতে মেনে নিল মায়েদের হিতোপদেশগুলো। দেখ-লেন তো, এক মা সন্তানতুল্য কিশোরদের পাঠালো উচ্ছন্নের পথে, আরেক মা ওদের স্নেহের পরশে তুলে আনলো আলোকিত পথে। আর মাঝখান দিয়ে আমি বোধ হয় এগুচ্ছিলাম সংঘাতের ভুল পথে।

ভদ্রলোকের কথা শুনে মনে হলো তিনি বোধহয় ঠিকই বলছেন। আই-নের জটিলতা আর সংঘাতের ভ্রান্তির বদলে মানব মনের সুপ্ত সুবিবেচনার জাগরণই বোধ হয় আমাদের অনেক সমস্যার নিয়ামক হতে পারে।

রচনাকাল ঃ ২৩ জুন ৮৫

www.pathagar.com

ক্যালিব, ক্যারেন এবং টিন এজারদের কথা

আমেরিকার লস এ্যাঞ্জেলসের বাসিন্দা ক্যালিব ভ্যালেন্টাইন। ২৬ বছর বয়স্ক এ যুবক ১১ বছর আগে গুলি করে মেরেছিল ক্যারেনকে। এতদিন একথা সে কাউকে বলেনি কিন্তু বিবেকের আগুনে পুড়েছে সে প্রতিনিয়ত। কিছুদিন আগে ক্যালিব এক সাংবাদিক সম্মেলন ডাকে। সম্মেলনে সে বলেঃ 'ক্যারেনকে আমিই পিস্তলের গুলীতে মেরেছি।' লোকে এত কাল জেনেছে, ক্যারেন আত্মহত্যা করেছে।

ক্যারেনের বয়স তখন ১৪ আর ক্যালিবের ১৫। টিন এজের এই দুই কিশোর-কিশোরীর মধ্যে যৌন সম্পর্ক ছিল। '৭৪ সালের নবেম্বরে ক্যারেন জানায় যে, সে গর্ভবতী। এ কথা শুনেই মাথা গরম হয়ে যায় ক্যালিবের। তখন সে ক্যারেনের গলার ভেতর দিয়ে গুলী করে। উদ্দেশ্য লোকে যাতে বুঝতে না পারে। সাংবাদিক সম্মেলনে ক্যালিব আরো বলে, ক্যারেনের গর্ভ ধারণের কথা শুনে আমি পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। আদালতে ক্যালিব জানিয়েছে, আমি অসম্ভব কষ্টকে ভুলে থাকতে অবিরত মদ খাচ্ছি।

অবিরত মদ খাওয়া যে ক্যালিবের কষ্ট লাঘব করতে পারেনি কিংবা বিবেকের দংশন থেকে বাঁচাতে পারেনি তার প্রমাণ সাংবাদিক সম্মেলনটি। বয়ঃসন্ধিকালের ভুল জীবনযাপন এ দুই কিশোর কিশোরীর জীবনে নিয়ে এসেছে অভিশপ্ত পরিণতি। পাশ্চাত্যে অবাধ স্বাধীনতার নামে যে স্বেচ্ছাচারিতা চলছে তারই শিকার হল এ দুই মানব সন্তান। অথচ উচ্ছলপ্রাণ-চঞ্চল টিন এজের এ দুটি প্রাণ যদি জীবনের চঞ্চল মুহূর্তে জীবন ও জগৎ সম্পর্কে প্রকৃত দিকনির্দেশনা পেত, তাহলে হয়তো তাদের ইতিবাচক কর্ম চাঞ্চল্যে পৃথিবী আরো সমৃদ্ধ হতে পারতো। কিন্তু তাদের সেই দিক নির্দেশনা দেবে কে? রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার বিতর্কে নাই বা গেলাম। পরিবারও তো ওদের জীবন ও জগৎ সম্পর্কে মৌলিক ধারণাটি দিতে পারতো। এখানেই বোধ হয় ক্যালিব আর ক্যারেনদের ট্র্যাজেডি। ক্যালিব-দের পিতা-মাতারা তো এখন ঘরের চাইতে ক্লাবেই বেশী সুখ(?) খুঁজে

www.pathagar.com

পায়। তাদের সময় কোথায় যে পরিবারের সব খোঁজ-খবর রাখবে। নইলে কি আর দু'জন কিশোর কিশোরী দিনের পর দিন অবৈধ যৌনাচারে লিপ্ত থাকতে পারতো? আর ব্যালিবদের পিতা-মাতারা যদি একান্ত বাধ্য হয়ে আত্মসুখ বিসর্জন দিয়ে ক্লাব ছেড়ে গৃহমুখী হয়ে যেতেন তাহলেও কি ব্যারেনরা জীবনের অভিশপ্ত পরিণতি থেকে বাঁচতে পারতো? আমার তো কেমন সন্দেহ হয়। পাশ্চাত্যের বস্তুবাদের নির্যাস যে ভোগবাদ, সে ভোগ বাদে যারা আকণ্ঠ নিমজ্জিত, তারা সন্তানদের জীবন ও জগত সম্পর্কে কিইবা নির্দেশিকা দেবেন? সন্তানরা তো পিতাদের নন্দিত দেহজকামনা বাসনার সেই গড্ডলিকা প্রবাহের নরকেই গা ভাসিয়ে দিয়েছে। কিন্তু দেহজ কামনা বাসনার উর্ধেও যে মানুষের বিবেক আছে, আত্মা আছে, আর তার শান্তিই যে প্রকৃত শান্তি---একথার প্রমাণ তো ব্যালিব নিজেই। ব্যারেনকে হত্যা করে তো সে নিজের ভ্রষ্টতার সব প্রমাণই পৃথিবী থেকে মুছে ফেলেছিল। কিন্তু কোন জিনিস তাকে হত্যাকাণ্ডের ১১ বছর পরও নিজের দোষকে সেচ্ছায় স্বীকার করতে অনুপ্রাণিত করলো? আসলে সে জিনিসের নাম বিবেক, সে জিনিসের নাম আত্মা। এই বিবেকের পথে ফিরে না আসলে পাশ্চাত্য দর্শন ভোগবাদী সমাজ কাঠামোর লালসায় ব্যালিব আর ব্যারেন-দেরই উপহার দিয়ে যাবে।

পাশ্চাত্যের টিন এজারদের কথা তো বলা হলো, কিন্তু আমাদের টিন এজাররা কেমন আছে? সেদিন বাংলাদেশের একটি পত্রিকায় এদেশের টিন এজারদের সম্পর্কে একটি বিশেষ প্রতিবেদন পড়ছিলাম। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছেঃ টিন এজটা না কৈশোর না যৌবন। বয়েসটা সকালও নয়, দুপুরও নয়। সলাজ বললেও ঠিক হয় না, নিলাজ বলতেও মন চায় না। এ সময় সমস্ত শরীর মনে যেন হৈ হৈ, রৈরৈ কাণ্ড ঘটে। সময়টা বাগে রাখা সাংঘাতিক ঝামেলা।

টিন এজারদের এ সময়টা বাগে রাখা যখন সাংঘাতিক ঝামেলার কাজ তখন আমরা তাদের এ দুর্যোগের সময় প্রকৃত অর্থে তেমন সহযোগিতা করছি কি? আমি আসলে পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক সহযোগিতার কথাই বলছি। আমাদের সহযোগিতার হাত যে তেমন প্রশস্ত নয় পত্রিকা-টির রিপোর্টে সে কথাই প্রতিধ্বনিত হয়েছে। পত্রিকার রিপোর্টে বলা হয়েছেঃ আজকাল টিন এজের ছেলেরা বড় বেড়েছে। অনেকে ঘাড় বেয়ে মাথায় চড়েছে। মাস্তানীর পাঠ নিচ্ছে অনেকে সদলবলে।.....

www.pathagar.com

বোধকরি ও ধরনের নোংরা আচার ও কায়দা রপ্ত করেছে পচা সিনেমা দেখে। 'দস্যু বনহুর' জাতীয় রহস্য পড়ে পাহলোয়ান হচ্ছে অনেকে। ইদানীং পর্নো পত্রিকা বাজারে কাটছে বেশ। সদ্য যুবকরা তুমুল কিনছে সেগুলো। অতঃপর যা হবার তাই। ১৯৮৪ সালে চাকু দিয়ে এক কিশোর তার বন্ধুকে হত্যা করেছিল ঢাকায়। আর এ বছর ১৫ বছরের ছেলে ৩৫ বছরের নারী ধর্ষনের আসামী হয়ে এখন পালিয়ে বেড়াচ্ছে। এছাড়া চুরি-চামারি, মহল্লার দাঙ্গা-হাঙ্গামা তো আছেই। এতবেই নষ্ট কায়দায় ফতুর হচ্ছে বয়ঃসন্ধিকাল। কিছু কিছু টিন এজার মেয়েও বেজায় পেকেছে। যুগের কি যে বাতাস! বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ লাপাত্তা। তারপর আদালতে বলে বসে, আমি মা হতে চলেছি।

পত্রিকাটি টিন এজারদের কর্মকাণ্ডের আরো কিছু চিত্র তুলে ধরে অবশেষে বলেছেঃ এদেশে 'টিন এজ' যথাযোগ্য 'কেয়ার'-এ বাড়ছে না।তাদের চেতনাকে সমৃদ্ধ পথে পরিচালনার রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব প্রায় অনুপস্থিত। সামাজিকভাবে অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে গড়ে উঠছে না কোন সম্মিলিত প্রতিরোধ। শুধু অভিভাবকদের ওপর দোষ চাপিয়ে খালাস পাওয়ার কোন জো নেই। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা, বিনোদন মাধ্যম সব কিছুতেই একটি মস্তবড় ফাঁক রয়ে গেছে। যা থেকে পর্যাপ্ত 'প্রোটিন' সংক্রমিত হচ্ছে না কিশোর চিত্তে। অতএব ক্ষুধার্ত বয়স যথেচ্ছ প্রশাখা বিস্তার করছে নিরুপায় বুনোলতার মতো। রাজনৈতিক অস্থিরতার এ দেশে স্থির ঘটনা নিয়ে বিস্তারিত হতে পারছে না কিশোর বয়স। অন্যদিকে কোন সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক কাঠামোও নেই তাদের সামনে। ঘোলাজলের মত সাংস্কৃতিক দীনতার মধ্যে বয়সের গুণাবলী বিকশিত হতে পারে না। আমাদের ঐতিহ্যের বিকৃতি এবং নির্দ্বিধায় বিদেশী অনুকরণ তারুণ্যের শিরদাঁড়াকে ন্যুব্জ করছে। কোমল বয়স যত্রতত্র পাচ্ছে নষ্ট হওয়ার উপাদান, উপকরণ।.... বলা বাহুল্য যতক্ষণ না গোটা সমাজ তার আগামীকালের মানুষদের যত্ন নেয় ততক্ষণ ব্যক্তি-প্রয়াস খণ্ডিতই থেকে যায়। সকলের কাছে আমাদের দাবী, বয়সের সবচে সম্ভাবনাময় এবং সংবেদনশীল 'টিন এজ'-এর নিরাপদ বিকাশ নিশ্চিত করতে এগিয়ে আসুন।

'টিন এজ' নিয়ে প্রতিবেদকের এই যে পাণ্ডুলিপি, জানি না তা আমাদের রাষ্ট্র, সমাজ ও পরিবারগুলো কিভাবে গ্রহণ করবে। তারা প্রতিবেদকের

www.pathagar.com

এ পাণ্ডুলিপিটি যদি আপাতত প্রত্যাখ্যানও করেন তাতেও তেমন আশ্চর্য হব না। কারণ বৃটিশ লেখক উইলিয়াম গোল্ডিং-এর নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত উপন্যাস 'লরড অবদ্য ফ্লাইজ'-এর পাণ্ডুলিপিটিও একুশবার প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। কিন্তু অবশেষে উইলিয়াম গোল্ডিং-এরই হয়েছে জয়। কিশোরেদের নিয়েই গোল্ডিং-এর এ উপন্যাস। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ লেখককে এ প্রজ্ঞা দেয় যে, মানুষের অন্তরের মধ্যেই অন্যায় ও পাপের বাসা। এ বিষয়বস্তুরই উপন্যাস রূপ হলো 'লরড অব দ্য ফ্লাইজ'।

আনবিক যুদ্ধের হাত থেকে বাঁচাতে স্কুলের একদল বালককে বিমানে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। কিন্তু বিমানটি পথে আক্রান্ত হয়। ভাগ্য ক্রমে কয়েকটি বালক প্যাসেঞ্জার টিউব থেকে প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে একটি প্রবাল দ্বীপে গিয়ে পড়ল।

দ্বীপের নতুন পরিবেশে জীবন যাপন করতে গিয়ে দ্বন্দ্ব দেখা দিল নীতিবান র‍্যালফের সঙ্গে জ্যাকের। জ্যাক র‍্যালফ ও তার অনুসারীদের অনেক ভুগিয়েছে। এমন কি র‍্যালফের বন্ধুদের হত্যাও করেছে। কিন্তু অবশেষে জয় হয়েছে র‍্যালফেরই। উপন্যাসটিকে সমালোচকদের কেউ কেউ বলেছেন প্যারাবল অর্থাৎ কোন রূপকের মধ্য দিয়ে নীতিকথা বলা। কেউ বলেছেন সিমবলিক অর্থাৎ প্রতীকী। প্যারাবল বা সিমবলিক যাই হোক না কেন, উপনাসটির মর‍্যাল-ভ্যালুজই আমাদের বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আর ২১ বার প্রত্যাখ্যাত এ উপন্যাসটি নোবেল পুরস্কার পাবার প্রধান কারণও বোধ হয় সেটাই।

'লরড অব দ্য ফ্লাইজ'-এর সার্থক পরিণতি দেখে আমারও মনে আশাবাদ জাগে। তাই 'টিন এজ'-এর প্রতিবেদককে অভয় দিয়ে বলতে পারি, ঘাবড়াবার কোন কারণ নেই। লস এ্যাঞ্জেলসের ক্যালিব যখন ১১ বছর পরও বিবেকের দংশনে সাড়া দিতে বাধ্য হয়েছে, তখন আপনার রিপোর্টের ডাকেও একদিন সবাইকে সাড়া দিতে হবে। কারণ সুন্দরভাবে বাঁচতে হলে তো ঘুরেফিরে মুক্তির সুনির্দিষ্ট পথে আসতেই হবে। তাই 'লরড অব দ্য ফ্লাইজ'-এর মত আপনার পাণ্ডুলিপি আপাততঃ প্রত্যাখ্যাত হলেও শাশ্বত মর‍্যাল ভ্যালুজের সেই আহবানকে একদিন সবার স্বীকার করতেই হবে।

রচনাকাল : ২৪ নভেম্বর ১৯৮৫

www.pathagar.com

পিতা-মাতারা কেমন আছেন

'হায় এ শহরে কে কেমন আছে কেউ জানে না।' নগর বাসী সম্পর্কে কবির এ অনুভব একান্ত বাস্তব অনুভব। কবির এ উক্তিতে শুধু সাহিত্যিক বাস্তবতা আছে বললে ভুল বলা হবে, এখানে আছে শতাব্দীর একটি সাহসী রিপোর্ট।

শিল্প বিপ্লবের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে পাশ্চাত্যের Individuality বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ। এই ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের শাণিত ও সুঁচালো স্ফুরণ আমরা লক্ষ্য করি নগর-সভ্যতার সুরম্য সমাজে। এখানে 'এটিকেট' আছে কিন্তু আন্তরিকতা নেই। এই পোশাকী সভ্যতায় সব থেকেও মনে হয় কিছুই নেই। তাই পাশ্চাত্যের বিদগ্ধ হৃদয়ে এখন বিরাজ করছে শূন্যতা। সন্দেহ-সংশয়ের বদলে ওরা এখন চায় আস্থা। বিশ্বাস তাই ওদের কাছে এখন হয়ে উঠেছে প্রিয়। আত্মকেন্দ্রীকতার সুরম্যপ্রাসাদ থেকে ওরা চায় মুক্তি।

কিন্তু আমাদের অবস্থাটা কি? সাম্প্রতিক ইতিহাস তো এ কথাই বলে, পাশ্চাত্যের বহু বছরের বাসি জিনিস আঁকড়ে ধরে আমরা আধুনিক হয়ে উঠি। ওদের বোঝার বহু বছর পর আমরা বুঝতে পারি– জিনিসটি ভুল, জিনিসটি অবেজো। কিন্তু পাশ্চাত্যের আগে কি মূল সত্যকে আমরা বুঝতে পারি না? আমাদের কাছে কি নেই কোন উপায়– নেই কোন আলোক বর্তিকা? আমরা কি কখনো অগ্রবর্তী হয়ে পৃথিবীকে দেখাতে পারবো না পথের দিশা?

কবি তো আক্ষেপ করে বলছেন, 'হায় এ শহরে কে কেমন আছে কেউ জানে না।' কে কেমন আছে সেতো দূরের কথা, আমরা কি ঘরের পাঁচ জনের খবরটা রাখি? খবর রাখি বৃদ্ধ মা-বাবার? তাঁরা তো বেশীর ভাগই পড়ে আছেন গ্রামে। আর যে ক'জনা আছেন শহরে তাদের অবস্থাই বা কেমন? 'সিঙ্গেল ইউনিটে' আস্থাবান আধুনিক পরিবারে তারা ভাল আছেন কি?

আমরা তো এখন নগরবাসী। কিন্তু আমাদের পূর্ব পুরুষের নিবাস ছিল কোথায়? খুব বেশী দূরে যেতে হবে না। দু'একে পুরুষ গেছেন

www.pathagar.com

তাকালেই আমরা দেখতে পাব গ্রাম। হ্যাঁ সহজ সবুজ গ্রামেই ছিল আমাদের পূর্ব পুরুষদের নিবাস। তাঁরা ছিলেন চাষা, জেলে, কামার-কুমার। এইতো আমাদের ইতিহাস, আমাদের Root।

কিন্তু তাঁরা কেমন ছিলেন? তাঁরা তাদের পিতা-মাতাদের সাথে কেমন আচরণ করতেন? আর সন্তানদের প্রতি তাদের ব্যবহার কেমন ছিল, তার সাক্ষী তো আমরা নিজেরাই। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে শেষ সম্পদ 'জমি' বিক্রি করে তারা আমাদের লেখাপড়া শিখিয়েছেন—মানুষ করেছেন, কিন্তু আমরা মানুষ হয়েছি কি?

গ্রামের কথা বলছিলাম। ছোট বেলায় শহরে থাকলেও স্কুলের দীর্ঘ ছুটিতে যেতাম গ্রামে। সে সময় শর্ষে, তিল, মটর সুটি আর কলাই ক্ষেতের প্রতি যে কি দুর্নিবার আকর্ষণ ছিল তা বুঝিয়ে বলতে পারবো না। সন্ধ্যার পরও ক্ষেত থেকে বাড়ী ফিরতে ইচ্ছে হত না। কিন্তু শীতের সন্ধ্যায় কুয়াশা লেগে শরীর খারাপ হবে বলে অভিভাবকরা বকুনি দিতেন। তাই অনিচ্ছাসত্ত্বেও ফিরতে হত বাড়ী। সে সময় গ্রামে বসবাসের দিন কটায় যে সমস্ত ঘটনা ঘটতো তার কিছু এখনো মনে আছে। একবার এক আত্মীয় এসে দাওয়াত দিয়ে গেলেন বাড়ীর সবাইকে। এ ধরনের দাওয়াতকে গ্রামে বলা হয় 'চাপে দাওয়াত'। বড় কোন মেজবানি হলে গ্রামে এ ধরনের দাওয়াত মেলে। যথাসময়ে বাড়ীর সবাই দাওয়াতে যাওয়ার জন্য তৈরী হচ্ছিল। কিন্তু দেখা দিল সমস্যা। ছোটদের কারো জামা আছে তো পায়-জামা নেই, পায়জামা আছে তো জুতো নেই। তখন খোঁজ পড়ে কার কি বেশী আছে। কারণ সবাইকে মোটামুটি সাজিয়ে-গুজিয়ে নিতে না পারলে যে দেখতে খারাপ লাগবে। তাছাড়া এতে করে কারো কারো মনে দুঃখও লাগতে পারে। তাই বাড়ীর মুরুব্বীরা এ ব্যাপারে থাকতেন বেশ সচেতন। কিন্তু সেদিন একজনের পায়ে জুতোর কিছুতেই মিল হচ্ছিল না। যে জুতো জোড়া পাওয়া গেল তাও আবার সাইজে একটু বড়। তখন একজন বুদ্ধি দিলেন, জুতোর ভেতর নেকড়া ঢুকিয়ে নাও তাতে জুতো ছোট হয়ে যাবে। সে বুদ্ধি মত সেদিন সমস্যার সমাধান করা হলো। সেদিনের সে ঘটনাটি আজো আমার মনে দাগ কেটে আছে। 'সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে মোরা পরের তরে'---কবির এ কথা সেদিনের সে ঘটনা থেকে ভালভাবেই অনুভব করা যায়। উগ্র ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ ও আত্মকেন্দ্রীকতার মন্ত্রে

www.pathagar.com

উজ্জীবিত হলে সেদিন বোধ হয় আর সবার দাওয়াতে যাওয়া সম্ভব হতো না। তখন প্রতিযোগিতা হতো কার থেকে কে কত বেশী উজ্জ্বল হয়ে সাজতে পারে। আর এ প্রতিযোগিতা শুরু হলে ভেঙ্গে পড়তো গ্রামের সে পারিবারিক বন্ধন, আত্মীয়তার বন্ধন, রক্তের বন্ধন।

উগ্র ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ ও আত্মকেন্দ্রীকতার বিষফলতো এখন পাশ্চাত্য সমাজ হাড়ে হাড়ে ভোগ করছে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বাদের ধ্বজাধারীরাতো এখন বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে নিজেদের সাথে রাখতে রাজী নয়। তাই অসহায় বৃদ্ধ পিতা-মাতারা আশ্রয় নিচ্ছে 'ওল্ড এজ হোমে'। সেখানে একঘেয়েমিপূর্ণও নিরানন্দময় জীবন তাদের। সে এক দুঃসহ ব্যাপার। বৃদ্ধ বয়সে এমনিতে বেঁচে থাকাই কষ্টকর। ছেলে, বৌ-মা ও নাতি-নাতনি পরিবেষ্টিত হয়ে থাকলে অন্ততঃ মানসিক দিক থেকে কিছুটা শান্তি পাওয়া যায়। কিন্তু সে সৌভাগ্য পাশ্চাত্যবাসীদের জীবন থেকে দূর হতে চলেছে। আমরাও বোধ হয় এ ব্যাপারে আর পিছিয়ে থাকবোনা। কেননা পাশ্চাত্যের অনুকরণেই তো আমাদের প্রগতি!

আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারতেও সমস্যাটি নিয়ে ভাবা হচ্ছে। এ নিয়ে সেখানে ছবিও তৈরী হয়েছে। '36 chawrangi lane' নামের এ ছবিটি আন্তর্জাতিক পুরস্কারেও ভূষিত হয়েছে। ছবিটির কাহিনী মোটামোটি এ রকম—

এক বৃদ্ধা একাকী বাস করেন। তিনি চাকুরী করেন একটি স্কুলে। এক বৃদ্ধ ভাই ছাড়া শহরে তার আপনার বলতে আর কেউ নেই। ভাইটি আবার থাকে 'ওল্ড এজহোমে'। তাই বৃদ্ধা ভীষণভাবে একাকী। একদিন শহরে বৃদ্ধার সাথে দেখা হলো তার এক পুরানো ছাত্রীর। ছাত্রীটি তখন তার প্রেমিককে নিয়ে শহরে একান্তে থাকার জায়গা খুঁজছিল। স্নেহ বৎসল বৃদ্ধা ছাত্রীটির সমস্যা বুঝতে পারেন এবং সানন্দে ওদেরকে তাঁর সাথে থাকার আমন্ত্রণ জানালেন। ওরা বেশ মজা করেই বৃদ্ধার ঘরে দিন যাপন করতে লাগলো। বৃদ্ধাও ঘরে মানুষের অস্তিত্বে আনন্দ বোধ করলো।

এক সময় সে জুটির বিয়ে হয়ে গেল। ওরা গিয়ে উঠল নতুন বাড়ীতে। নতুন জীবনে এসে ওরা কিন্তু বৃদ্ধাকে এড়িয়ে চলতে লাগল। ওরা যে বৃদ্ধার আশ্রয়ে বেশ কিছুদিন ছিল সে কথাও যেন ভুলে গেল। একদিন বৃদ্ধা এদের বাড়ী যেতে চাইলে ওরা বললো, সেদিন ওরা বাসায় থাকবে

www.pathagar.com

না। সরলা বৃদ্ধার সাথে ওরা মিথ্যার আশ্রয় পর্যন্ত নিলো। তারপর ফিরে এলো নব দম্পতির বিবাহ-বার্ষিকী। বিবাহ বার্ষিকীতে যথারীতি অনুষ্ঠানের আয়োজন হলো বাড়িতে। বৃদ্ধাকে ওরা কিন্তু আমন্ত্রণ জানালো না। কিন্তু বৃদ্ধা ঠিকই ওদের বিবাহ-বার্ষিকীর দিনটিকে স্মরণ রেখেছিল। স্নেহের আবেগে তিনি আর দাওয়াতের তোয়াক্কা করেননি। সেদিন তিনি কেক হাতে উপস্থিত হলেন নব-দম্পতির বাড়িতে। গিয়ে দেখেন বর্ণাঢ্য সাজে সজ্জিত বাড়ি। ভেতরে চলছে আনন্দ-ফূর্তি। জানালার কাঁচ দিয়ে এ দৃশ্য দেখে বৃদ্ধা মনে খুব দুঃখ পেলেন। তাঁর মনে হল, এখানে তিনি অনাকাংখিত, অনাহুত। তখন তিনি ব্যথিত মনে ধীর পদবিক্ষেপে হেঁটে চললেন বাড়ীর দিকে। কিছুদূর যাওয়ার পর একটি কুকুর বৃদ্ধার পিছু নিল। এক সময় একটিলতে সবুজ ঘাস পেয়ে বৃদ্ধা সেখানে বসে পড়লেন। কুকুরটাও তার পাশ ঘেঁষে বসলো। বৃদ্ধা তখন কুকুরটিকে সে কেকটি খেতে দিলেন। তাঁর মনে হলো বন্ধু হিসেবে মানুষের চাইতে কুকুরই বেশী বিশ্বস্ত। এখানেই কাহিনীর শেষ।

উগ্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও আত্মসুখের মনোভাব আমাদের দেশেও বেশ প্রবল হয়ে উঠছে। বৃদ্ধ মা-বাবারা এখানে ভোগ করছেন মানসিক যাতনা। মনে যদি ভক্তি-শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা বোধ না থাকে মা-বাবার প্রতি, তাহলে তাঁরা আমাদের কাছে বোঝা হয়ে উঠবেন বৈকি। ধর্মে যতই বলা হোক না কেন, মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেশ্‌ত। মা-বাবার অস্তিত্বকে কেন্দ্র করে আমাদের শহরেতো কত রকম দুঃখজনক ঘটনাই ঘটে যাচ্ছে অহরহ। পুরানো ঢাকার এক পরিবারের কথা জানি, সেখানে টাকা দেয়ার শর্তে বৃদ্ধ বাবা খেতে পারেন ঘরে। প্রশ্ন জাগে, এই পিতা কি দীর্ঘদিন যাবত সন্তানের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পালন করেননি?

এ প্রসঙ্গে নতুন ঢাকার এক পরিবারের কথা উল্লেখ করতে হয়। বড় ছেলে, মা ও ছোট ভাই-বোনদের নিয়ে একসাথে থাকেন। মা ছেলেকে বিয়ে করালেন শিক্ষিতা মেয়ে দেখে। তার ধারণা ছিল শিক্ষিতা মেয়ে ঘরের সবাইকে নিয়ে মিলেমিশে চলতে পারবে। কিন্তু বৃদ্ধা মার ধারণা মিথ্যা প্রমাণিত হলো। ধীরে ধীরে তিনি বেশ কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করলেন। বাইরে যাওয়ার সময় ছেলে ও ছেলে বউ নিজেদের ঘরে তালা মেরে যেতে লাগলো। এরপর তালা পড়লো অপেক্ষাকৃত ভাল বাথরুমটিতে। অব-

www.pathagar.com

শেষে তালা পড়লো টেলিফোনে। ফ্রীজ চলে গেল ছেলের ঘরে। এ সব ঘটনায় বৃদ্ধা রীতিমত অপমান বোধ করলেন। নিজেকে মনে হল দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক। কিন্তু কি করবেন? এ না যায় সওয়া না যায় বওয়া। নিজের ছেলের বিরুদ্ধে তিনি অভিযোগ করবেন কার কাছে? কিন্তু সে দিন ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল বৃদ্ধার। মেয়ে সন্তান সম্ভবা। তার খবরাখবর জানা প্রয়োজন। বৃদ্ধা তাই বৌমাকে বললেন, ফোন করার কথা। বৌমা নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে বাইরে যাওয়ার আগে বলে গেলঃ মা ফোন রেখে গেলাম। মা ফোন করতে গিয়ে তো অবাক। তিনি কথা বলছেন কিন্তু অপরপক্ষ কিছুই শুনতে পাচ্ছে না। ছোট ছেলেকে ব্যাপারটি জানালে ও পরীক্ষা করে দেখে যে, ফোনের 'স্পীকার' যন্ত্রটি নেই। কে যেন তা তুলে রেখে গেছে। ঘটনা বুঝতে পেরে মা খুব মর্মাহত হলেন। বড় ছেলে ঘরে ফিরলে তাকে ঘটনাটি জানানা হলো। কিন্তু ছেলে স্ত্রীর দোষ স্বীকার করতে চায় না। ঘরে ফোন থাকা সত্ত্বেও পরের দিন দেখলাম বৃদ্ধাকে পাশের বাসা থেকে ফোন করতে। এ যেন নিজ ঘরে পরবাস। মা-বাবা নিজের সময় দিয়ে, সম্পদ দিয়ে, জীবন দিয়ে সন্তানকে বড় করে যখন বৃদ্ধ হয়ে পড়েন-অক্ষম হয়ে পড়েন, তখন আমাদের কাছ থেকে অনীহা ও দুর্ব্যবহারই কি তাঁদের প্রাপ্য? শিক্ষা দীক্ষা, নীতি-নৈতিকতা, ধর্মজ্ঞান কি এ ব্যাপারে আমাদের কিছুই নির্দেশ করে না। আমরাও কি তা'হলে পাশ্চাত্যের মত বৃদ্ধ বাবা-মাকে 'ওল্ড এজ হোমে' পাঠিয়ে নিজেরা আত্মসুখের স্বর্গ নির্মাণে অগ্রসর হবো?

রচনাকাল ঃ ১৭ ডিসেম্বর '৮৪

www.pathagar.com

আমাদের জীবন-যাপন

কোন কথা নেই, বার্তা নেই, সংকেত নেই। হঠাৎ করেই বাড়িওয়ালা উকিল-নোটিশ করলেন। এক মাসের মধ্যে বাসা ছেড়ে দিতে হবে। শুধু আমাকে একা নয়, আরেক ভাড়াটিয়াকেও করেছেন উকিল নোটিশ। কারণ দেখিয়েছেন, তার নিজেরই নাকি এখন সবটা বাসা প্রয়োজন।

উকিল নোটিশের জবাব দিতে আরেক উকিলের শরণাপন্ন হলাম। উকিল জানালেন, তিনটি কারণে বাড়িওয়ালা ভাড়াটিয়াকে উচ্ছেদ করতে পারে। ১। যদি বাড়িটি বাড়িওয়ালার নিজের ব্যবহারের জন্য প্রয়োজন হয়। ২। যদি ভাড়াটিয়া বাড়িতে অসামাজিক কার্যকলাপ চালান। ৩। যদি ভাড়াটিয়া নিয়মিতভাবে ভাড়া পরিশোধ না করেন। আমার মনে হল, বাড়িওয়ালা ঐ তিনটি কারণের কোনটিই প্রমাণ করতে পারবেন না। তাই বাড়িওয়ালার উকিল নোটিশের বক্তব্য যে সঠিক নয় তা জানিয়ে উকিলকে জবাব দিতে বললাম। জবাব দেয়ার কিছু দিন পর বাড়িওয়ালা খবর পাঠালেন, বাড়ীতে থাকতে পারেন যদি ভাড়া আরো নয় শ' টাকা বাড়িয়ে দেন। কথা শুনে অবাক হলাম। বেটা কি মিথ্যুকরে বাবা! এই উকিল নোটিশ পাঠালেন বাসাটা তার নিজের ব্যবহারে জন্য প্রয়োজন, আর এই বলছেন ভাড়া নয় শ' টাকা বাড়িয়ে দিলে থাকতে পারেন। ভাড়া বাড়াবার অংকটা যে ভয়ংকর রকমের বড় হয়ে গেল, বাড়িওয়ালা কি তা একবারও ভেবে দেখেননি? টাকা তো আর হাওয়ায় ঘুরে বেড়ায় না যে, ধরে এনে দিয়ে দেব। বেতনের সাথে যে বাড়ি ভাড়া পাই তার পুরো অংশটাই তো নয় শ' টাকার নীচে। তাই বাড়িওয়ালার বার্তা বাহককে বললাম, ওনাকে একটু ভেবে-চিন্তে যুক্তিসঙ্গত প্রস্তাব পাঠাতে বলবেন। বাসার পরিবার-পরিজন বললো ঃ ঝগড়া-বিবাদ করে আর এ বাসায় থেকে কাজ নেই, নতুন বাসা দেখ। কোন কারণ ছাড়া উকিল নোটিশ পাঠিয়ে বাড়ি ছাড়তে বলার মত অভদ্র ও অমানবিক কাণ্ড দেখে আমি নিজেও খুব মর্মাহত হয়েছি। তাই নতুন বাসার খোঁজে লেগে গেলাম। কিন্তু নতুন বাসা খুঁজতে গিয়ে ভাল

www.pathagar.com

করে অনুভব করলাম, "এ এক সোনার হরিণ"। বাসা পছন্দ হয় তো ভাড়া পছন্দ হয় না। ভাড়া পছন্দ হয় তো বাসা পছন্দ হয় না। অতএব বাসা খোঁজার ক্লান্তি নিয়েই দিন গুজরান করতে হচ্ছে।

সে দিন অফিসে এসে হাজির হলেন এক ভদ্রলোক। তিনিও এ কথা সে কথার মাঝে জানালেন, বাসা নিয়ে খুব দুশ্চিন্তায় আছি ভাই। বললেন, নতুন বছরে বাড়িওয়ালা ৭শ' টাকা ভাড়া বাড়াতে বলেছেন। তিনি নাকি বাড়িওয়ালাকে যুক্তি দেখিয়ে বলেছেন, বাসা থেকে গুলিস্তানে ৬ টাকার জায়গায় রিক্সাওয়ালা ১০ টাকা চাইলে আপনি দিতে রাজী হবেন কি? জবাবে নাকি বাড়িওয়ালা বলেছেন ঃ অতসব বুঝিনা, থাকতে হলে বাড়ীভাড়া ৭শ' টাকাই বাড়িয়ে দিতে হবে। তখন নাকি ভদ্রলোক বাড়িওয়ালাকে বলেছেন, তাহলে ভাড়াটা কোর্ট থেকেই বুঝে নেবেন। বাড়ীওয়ালা চটে গিয়ে বললেন, হ্যাঁ আপনি আমাকে কোর্টের ভয় দেখাচ্ছেন। ভদ্রলোক বললেন, উপায় কি?

আমিও ভাবছি উপায় কি? ভাড়ি ভাড়াইতো আমাদের জীবনযাপনের একমাত্র সমস্যা নয়। এখানে আছে অন্ন, বস্ত্র, চিকিৎসা সহ কত রকমের সমস্যা। আর সামাজিক সমস্যার কথা নাইবা বললাম। সংসারের ঝোলা যার কাঁধে চেপেছে সেই বোঝে এর ওজনটা কেমন। তবু এই ঝোলা কাঁধে নিয়েই তো আমাদের চলতে হবে। এবং এই ঝোলা থেকে কখন যে কোন্ সমস্যা বেরিয়ে আসবে তা একমাত্র আল্লাহই জানেন।

বাড়ি ভাড়া নিয়ে যখন হিমসিম খাচ্ছি তখন আবার হঠাৎ করে চট্টগ্রাম যাওয়ার প্রয়োজনটা দেখা দিল। এবার সফর সঙ্গী হল স্ত্রী এবং একমাত্র শিশু কন্যাটি। ট্রেনে প্রচণ্ড ভীড়ের কথা বিবেচনা করে ছোট ভাইটিকে আগে স্টেশনে পাঠিয়ে দিলাম জায়গা রাখতে। আমরা যথাসময়ে স্টেশনে গিয়ে টিকেট কাটলাম। টিকেট কাটা শেষ হতেই এক কুলি এসে জিজ্ঞেস করল ঃ সিট লাগবো স্যার? ব্যাপারটি বুঝতে দেরী হল না। বেটা কোন সমাজসেবা করতে আসেনি, এসেছে স্রেফ টাকার বিনিময়ে সিট বিক্রি করতে। স্টেশনে থাকার সুবাদে ওরা আগেভাগে গামছা বিছিয়ে সিট দখল করে ব্যবসাটা বেশ জমজমাট করে নিয়েছে। রেল কর্তৃপক্ষের কাছে জিজ্ঞাসা ঃ টিকেট বিক্রি করে যাত্রীদের বসার জায়গা দিতে না পারলেও সীমিত সিট থেকে মধ্যস্বত্বভোগীদেরও কি আপনারা হটাতে পারবেন না?

www.pathagar.com

মধ্যস্বত্বভোগীদের থেকে নয়, ছোট ভাইয়ের পরিশ্রমের ফলেই ট্রেনে মোটামুটি বসার জায়গা পেলাম। কিন্তু সবার তো আর ছোট ভাই নেই। তাই এই অভাবের দেশে টিকেট কেটেও দেখলাম অনেককে দাঁড়িয়ে থাকতে। এ আর আমাদের দেশে নতুন কিছু নয়। সবাই যেন এটাকে স্বাভাবিক হিসেবেই মেনে নিয়েছে। ট্রেন যত এগুতে লাগলো ভীড়ও ততই বাড়তে লাগলো। আগে ছিল বসার প্রতিযোগিতা, আর এখন শুরু হয়েছে দাঁড়িয়ে থাকার প্রতিযোগিতা। একেই বোধ হয় বলে চাহিদার আপেক্ষিকতা।

আসলে অভাবের সময়, সঙ্কটের সময়ই মানুষের মানবিকতার পরীক্ষা হয়ে যায়। এ পরীক্ষায় কখনো আমাদের দুঃখ মিলে, কখনও মিলে সুখ। ট্রেনের এই প্রচণ্ড ভীড়েও বোধ হয় সুখই পেলাম। কারণ, দেখলাম অসুস্থ মানুষ এবং অসহায় মহিলাকে বসার জায়গা করে দেওয়ার মত সহানুভূতি এখনো আমাদের মধ্যে জীবন্ত আছে।

ভীড়ের প্রচণ্ডতা যেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় এসে আরো তুঙ্গে উঠলো। এখানে মানুষ এবার দরজা দিয়ে ওঠার জায়গা না পেয়ে জানালার আশ্রয় নিল। হঠাৎ দেখলাম এক ভদ্রলোক জানালা দিয়ে একটি ব্যাগ এগিয়ে দিয়ে রাখতে বললেন। কিন্তু রাখার তো কোন জায়গা নেই। তবু ভদ্রলোক বললেন, প্লিজ রাখুন। ভদ্রলোকের বিপন্ন চেহারা দেখে ব্যাগটি পা রাখার জায়গায় রাখা হলো। কিন্তু এর পর ভদ্রলোক একে একে আরো চারটি ব্যাগ বাড়িয়ে দিলেন। এর একটিতে ছিল শিশুর দুধের বোতল, দুধের টিন ইত্যাদি। ভদ্রলোকের সাথে যে মহিলা ও শিশু আছে এবার তা বোঝা গেল। তাই ভদ্রলোকের বিপদ টের পেয়ে আমরা ব্যাগগুলো বিভিন্ন কৌশলে কোনরকমে ট্রেনের ভেতর রাখার ব্যবস্থা করলাম। ট্রেন ছেড়ে দিল কিন্তু ভদ্রলোকের দেখা নেই। পরপর আরও কয়েকটি স্টেশন পেরিয়ে গেল ট্রেন কিন্তু ভদ্রলোকের কোন পাত্তা নেই।এক ভদ্রলোক রসিকতা করে বললেন, একেই বলে ভাগ্য---কি নির্বিবাদে আমরা কতগুলো জিনিসের মালিক হয়ে গেলাম। আরেক ভদ্রলোক বললেন, না জানি কি বিপজ্জনক জিনিস গছিয়ে দিয়ে গেছেন বেটা আমাদের ঘাড়ে। যখন এমনি জল্পনা-কল্পনা চলছিল তখনই দেখা পেলাম ভদ্রলোকের। প্রচণ্ড ভীড়ে ভদ্রলোক আমাদের কাছে আসতে পারছেন না। দূর থেকেই জিজ্ঞেস করলেনঃ আমার ব্যাগগুলো আছে তো ভাই?জবাবে আমার পাশের ভদ্রলোক বললেন, জিনিসগুলো আমাদের গছিয়ে

www.pathagar.com

দিয়ে তো খুব আরামে আছেন, তাই না? ভদ্রলোক করুণ কণ্ঠে বললেন, সামনের দরজা দিয়ে কোন রকমে ট্রেনে উঠেছি ভাই। কিন্তু এদিকে আর আসতে পারিনি। সেখানে এতো ভীড় যে, তার ঠ্যালায় স্ত্রীকে টয়লেটে ঢুকিয়ে রেখেছি ভাই। দেখি সেখানে বেচারীর কি হাল হয়েছে। ভদ্রলোকের কথা শুনে হাসব কি কাঁদব ভেবে পেলাম না। জানি না, আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থার বর্তমান হাল দেখলে ইবনে বতুতাও ঘর থেকে বেরুতেন কিনা—বিশ্ব ভ্রমণ তো দূরের কথা।

ওভার লোড নিয়ে ট্রেন বেচারা বোধ হয় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। তাই বেশ ধীর গতিতেই চলছিল। এদিকে কিন্তু পেটে ক্ষুধার গতি বেশ বেড়ে গিয়েছিল। এ সময় এক ছোট্ট ছেলে এসে নাস্তা করবো কি না জিজ্ঞেস করলো। সম্মতি পেয়ে সে নাস্তা নিয়ে এল। সামান্য নাস্তার দামটাও বোধ হয় একটু বেশীই চাইলো। পাশের দু'একজন ভদ্রলোক ধমক লাগালেন, এতো দাম চাস কেন বেটা। ছেলেটির মুখের দিকে চেয়ে আমার খুব মায়া হল। যে বয়সে ছেলেরা স্কুলে যায়, মা-বাবার কাছে নানা বায়না ধরে, সে বয়সে ওরা নেমেছে জীবন-যুদ্ধে। দুটো পয়সা বেশী চাইলে আর ওদের দোষ কি। বাবা-মা তো ওদের পালতে পারছে না—উল্টো বাবা-মা, পরিবারের সাহায্যেই ওদের নামতে হয়েছে পথে। আমরা তো বলি 'শিশু-শ্রম বন্ধ কর'। কিন্তু শিশু শ্রমিকদের জন্য কি কোন সামাজিক বা রাষ্ট্রিক ব্যবস্থা কি আমরা করতে পেরেছি?

ঢাকা থেকে প্রায় সাড়ে ৮ ঘণ্টায় ট্রেন চট্টগ্রাম পৌঁছল। উঠলাম গিয়ে বোনের বাসায়। সেখানে পরিচয় হলো এক চেয়ারম্যানের সাথে। গ্রামেই থাকেন। কি একটা কাজে শহরে এসেছেন। অনেক প্রসঙ্গেই ভদ্রলোকের সাথে আলাপ হলো। আলাপ প্রসঙ্গে ভদ্রলোক জানালেন বন্যার কথা। বললেন, রিলিফ তো কিছু কিছু পেয়েছি কিন্তু তা দিয়ে আর ক্ষতির কতটুকু পোষানো যায়। প্রসঙ্গক্রমে ভদ্রলোক বাঁধের কথা বললেন। বললেন, হাজার হাজার একর ফসলি জমি নষ্ট করে এই যে বাঁধ দেয়া হচ্ছে, তাতে আমাদের কি লাভ হবে? বাঁধ দিলে জমিতে তো আর পলি পড়বে না। তখন সারের উপর নির্ভর করেইতো আমাদের জমি চাষ করতে হবে। সারের যা দাম—তখন দেখা যাবে লাভেরটা কুমিরেই খাবে। তাছাড়া সার ব্যবহার করতে করতে জমির উর্বরা শক্তিও যাবে নষ্ট হয়ে। আর

www.pathagar.com

আমাদের দেশের ঋতুর সাথে তাল মিলিয়ে আমরা এখন যে সমস্ত ফসল উৎপাদন করি, বাঁধের ফলে তার প্রকারগত দিক থেকে তেমন তারতম্য হবে বলে মনে হয় না। তিনি জানালেনঃ বাঁধ এলাকার ফসলের অবস্থা সম্পর্কে সরেজমিনে জ্ঞান দেবার লক্ষ্যে আয়োজিত এক প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামে চাঁদপুর এলাকায় গিয়েছিলাম। সেখানে তো ধানের ফলন ভাল লক্ষ্য করিনি। তিনি বাঁধ দেয়া প্রসঙ্গে একটি অভিযোগ উত্থাপন করে বললেনঃ কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করার আগে আমাদের থেকে কোন পরামর্শ গ্রহণ করা হয় না। পরিকল্পনা গ্রহণ করার পর তা বাস্তবায়নের প্রয়োজনে শুধু আমাদের ডাকা হয়। আর তখন আমাদের ডেকে পরিকল্পনার উপকারিতার দিকটুকুই শুধু বোঝানো হয়। এর যে কোন ক্ষতির দিকও থাকতে পারে সে সম্বন্ধে আমাদের কিছু অবহিত করা হয় না।

দেশের বাঁধ ও রাস্তা মেরামত সম্পর্কে তো কারিগরি সমিতিরও অভিযোগ রয়েছে। দেশের সাম্প্রতিক বন্যার পেছনে এ সমস্ত বাঁধ ও রাস্তা নাকি অনেকাংশে দায়ী। প্রযুক্তি চিন্তাহীন ত্রুটিপূর্ণ পরিকল্পনার ব্যাপারে সতর্ক থাকার জন্য তাঁরা দেশবাসীর প্রতি আহবান জানিয়েছেন। সে যাক, বাঁধ প্রসঙ্গে চেয়ারম্যানের অভিমত হলোঃ বাঁধের পেছনে কোটি কোটি টাকা খরচ না করে তা যদি উৎপাদনশীল অন্য কিছুতে খরচ করা হতো—খরচ করা হতো শিল্পখাতে, তাহলে সেটা দেশের জন্য হতো আরো বেশী মঙ্গল জনক। চেয়ারম্যানের বক্তব্য সঠিক কিনা তা নির্ধারণ করতে পারেন বিশেষজ্ঞরা। তবে এ ক্ষেত্রে ভাবার মত কিছু থাকলে সরকারের অবশ্যই তা ভাবা উচিত।

পরদিন দুপুরে এক আত্মীয় এলেন তাঁর বাসায় বেড়ানোর আহবান নিয়ে। তাঁর বাসা নদীর ওপারে বন্দর থানায়। যেতে হবে কর্ণফুলী নদী পার হয়ে। স্পীডবোটে উঠে আমার দেড় বছরের মেয়েটি বেশ ভয় পেয়ে গেল। ভয় পাবে না কেন? যার জননী সাঁতার জানেনা তার পক্ষেতো ভয় পাওয়াই স্বাভাবিক। আর লুসাই বন্যা কর্ণফুলীর স্রোতের তোড় এই শীতেও অশ্রদ্ধা করার মত নয়। নদী পার হওয়ার পথে দেখলাম সেই থাই-ট্রলার, এতোদিন পত্রিকাতেই যার খবর পড়েছি। চুরি করে মাছ ধরতে এরা বেশ ওস্তাদ। প্রায়ই বাংলাদেশ সীমানায় ওরা ধরা পড়ে। ট্রলারের ছাদে দেখলাম মাছের অসংখ্য শুটকি। অল্প সময়ের মধ্যেই যন্ত্র-

www.pathagar.com

যানের কল্যাণে নদীর তীরে নামলাম। নেমেই চোখে পড়ল বিরাট এক প্রকল্প এলাকা। নাম 'শিকলবাহা বিদ্যুৎ প্রকল্প'। এখানে নাকি গ্যাসের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হবে। শুনে বেশ ভাল লাগলো। বিভিন্ন বিকল্প ব্যবস্থার প্রতিও তাহলে আমাদের নজর পড়েছে। এ প্রকল্প পূর্ণোদ্যমে চালু হলে নিশ্চয় দেশের অর্থনীতিতে তার একটা ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। কারণ আমরা জানি প্রযুক্তিই উন্নতি। প্রযুক্তি চিন্তাহীন রাষ্ট্রনীতি তো দেশকে খুব বেশী দূর এগিয়ে নিতে পারবে না।

কিছুদূর হাঁটার পর আমাদের ডানে-বামে দেখলাম বিস্তৃত মাঠ। রাস্তার দু'পাশে আছে গাছ-গাছালী। হঠাৎ করে এক ঝাঁক পাখী কিচিরমিচির করে উড়ে গেল! তা দেখে আমার ছোট্ট মেয়েটি হাত-পা নেড়ে বিভিন্ন ধ্বনির মাধ্যমে আনন্দ প্রকাশ করতে লাগলো। বুঝলাম, শহরের গুমোট পরিবেশের বাইরে এই উদার-প্রকৃতি দেখে ও বেশ খুশী হয়েছে। বিদ্যুৎ প্রকল্পের কাছেই আমার আত্মীয়ের বাসা। তাই পৌঁছতে দেরী হলোনা। বাসার পরিবেশ ও পরিসর দেখে আমাদের বেশ ভালই লাগলো। কিন্তু আমার আত্মীয়া দুঃখ প্রকাশ করে বললেন, "এই নিরিবিলিতে দীর্ঘদিন থেকে একেবারে হাঁপিয়ে উঠেছি ভাই। দু'জন লোক পাই না যে, মনের কথা একটু খুলে বলি। এইখানে মানুষ থাকে?" এ যে নগরবাসীর একেবারে বিপরীত কথা। নগরীতে তো নিরিবিলি থাকার কোন উপায় নেই। সবখানেই শুধু ভীড় আর ভীড়।

গ্রামের এই উদার পরিবেশে অতিরিক্ত ঠাঁই পেয়ে আমার এ আত্মীয়রা হাঁপিয়ে উঠেছেন। তাই তাঁরা চেষ্টা করছেন ঢাকায় বদলি হতে। কিন্তু ঢাকায় যখন বর্তমান আবাস বাড়ীর একতৃতীয়াংশ স্থানও খুঁজে পেতে আমাদের মত হিমসিম খাবেন তখন কি তারা আর একবার হাঁপিয়ে উঠবেন না?

আসলে এখানেই আমাদের সমস্যা। আমাদের রাষ্ট্রীয় কাঠামোটাই এমনভাবে গড়ে উঠেছে যে, নগরী এখন মানুষের চাপে বিপর্যস্ত। আর গ্রাম হচ্ছে বিরান। তাই এখন আমাদের রাষ্ট্রীয় কাঠামো, রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি এমনভাবে পুনর্গঠিত হওয়া প্রয়োজন যাতে করে নগর, উপকণ্ঠ আর গ্রামগঞ্জের মধ্যে নির্মিত হবে সম্পর্কের একটি নতুন সংযোগ-সেতু। সংযোগ সমন্বয় ও ভারসাম্যের এই সংযোগ সেতু নির্মিত না হলে আমাদের হয়তো আবার আক্ষেপ করে বলতে হবে: "---দাও সে অরণ্য, লহ এ নগরী"।

রচনাকাল: ৩০ ডিসেম্বর ১৯৮৪

www.pathagar.com

শবেবরাতের পটকা এবং দাদার কথা

সূর্য ডোবার সাথে সাথেই অপারেশন স্টার্ট হয়ে গেল। কেউ যেন সুইচ টিপে বললঃ সূর্যের পাট শেষ, এবার তোমাদের পালা। দেখা যাক কার কর্মকাণ্ডে কেমন তেজ। যেমনি বলা তেমনি কাজ।

শুরু হয়ে গেল চারদিকে পটকা, তারা বাতি, মরিচাবাতি আর ব্যাঙ বাতির হৈ-হৈ রৈ-রৈ কাণ্ড। তার সাথে চললো রকেট বোমের অভিজাত অভিযান। ভাগ্যিস, শবেবরাত বলে রক্ষে। নয়তো এতে ঠুস-ঠাস আওয়াজ আর আলোকোজ্জ্বল শোঁ শোঁ শব্দে জনপদের মানুষগুলো নিশ্চয় ভীষণভাবে আতঙ্কিত হয়ে পড়তো। আর আতঙ্ক মুক্তির ব্যাপারে পুলিশের প্রেস রিলিজ ও কম অবদান রাখেনি। সবাই পত্রিকা মারফত জানতে পারলোঃ শবেবরাতের রাতে পটকা ও বাজি পোড়ানো হতে পারে, যদিও তার জন্য শাস্তির বিধান আছে। অবশ্য এ প্রেস রিলিজ অবগতির অবদান ছাড়া আর কিছু করতে পেরেছি কি না তা জনপদের জনগণের জানা নেই।

চারদিকের পটকা-বাজি আর হালুয়া -রুটিতে আমি যখন আকণ্ঠ নিমজ্জিত, তখন ভাবলামঃ এভাবে ডুবে যাওয়াটা কি ঠিক হচ্ছে? সামাজিক চাপেরও তো একটা মূল্য আছে। তাই ঘর থেকে বেরিয়ে দু'চারটা ধমক-ধামক দিলাম। কিছুটা কাজ হলো বোধ হয়। উপস্থিত পিতা-মাতাদের লক্ষ্য করে বললামঃ এসব উটকো পীড়ন থেকে বাঁচার জন্য অভিভাবকদেরও বোধ হয় কিছু করণীয় আছে। সন্তানদের বুঝাবার প্রয়োজন আছে। সবাই মাথা নেড়ে সায় দিলেন। তবে এ সায় কি ঠায় বসে থাকবে, না কোন কাজ করবে তা আল্লাহই ভাল জানেন।

শবেবরাতে উটকো পীড়নে আমি যখন পীড়িত তখন মনে হলো, ঘরে বসে বসে এ পীড়ন সহ্য করে লাভ কি। বরং তার চাইতে মসজিদে যাওয়াটাইতো অধিকতর নিরাপদ।

মসজিদে গিয়ে কিছু নামাজ আদায় করার পর মনে বেশ প্রশান্তি অনুভব করলাম। এরপর লক্ষ্য করলাম, ইমাম সাহেবকে ঘিরে কিছু লোক

www.pathagar.com

বসে বসে গভীর মনোযোগের সাথে কি যেন শুনছে। আমিও কাছে গিয়ে বসলাম। ইমাম সাহেব তখন বলছিলেনঃ আজ তো আমরা নিজ নিজ পাপের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবো। আল্লাহ হয়তো আমাদের অনেককেই ক্ষমা করে দেবেন। কিন্তু অজকের এই পবিত্র রাতেও আল্লাহ সাত ধরনের মানুষকে ক্ষমা করবেন না। এই সাত ধরনের মানুষ হলঃ ১। যাদুকর। ২। মদ্যপায়ী ৩। আত্মীয়স্বজনদের সাথে সম্পর্ক ছিন্নকারী ৪। পিতা-মাতার অবাধ্য ব্যক্তি ৫। জিনাকারী ৬। চোগলখোর এবং ৭। বখিল বা কৃপণ ব্যক্তি।

অবশ্য ইমাম সাহেব একথাও বললেন যে, উক্ত সাত প্রকার ব্যক্তি যদি এ রাতে তওবা করে এবং ওয়াদা করে যে, অবশিষ্ট জীবনে এ পাপে আর জড়াবো না, তবে আল্লাহ পাক হয়তো তাদের মাফ করে দিতে পারেন।

মসজিদ থেকে বাড়ি ফিরে বেশ চিন্তায় পড়ে গেলাম। ভারী বিপদতো। যতো এবাদত আর প্রার্থণাই করি না কেন, ঐ সাত দফার আওতায় পড়ে গেলেতো সব বরবাদ। তাই নিকেশ নিতে লাগলাম আমি কোনো দফার আওতায় পড়ে যাই কিনা। যাদুকর, মদ্যপায়ী, জিনাকারী, চোগলখোর ও বখিল নই বলে কিছুটা স্বস্তি পেলেও আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্কের প্রশ্নটি ভেবে কিছুটা আঁতকে উঠলাম। বিশেষ করে গ্রামের আত্মীয়-স্বজনদের কথা মনে পড়লো। আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন না করলেও অনেকদিন পর্যন্ত তাদের কোন খোঁজ-খবর নেইনি। আর কিছুদিন হলো চাকুরী থেকে অবসর নিয়ে বাবাও গ্রামে গিয়ে বসবাস করছেন। লোকমুখে বাবার অসুখের খবর শুনে গ্রামে যাবো যাবো করছিলাম, কিন্তু ইমামের বক্তব্য শুনে বিষয়টিকে জরুরী হিসেবে গ্রহণ করলাম। যেন এক ধাক্কায় গ্রামের বাড়ি পৌঁছে গেলাম।

বাড়ি পৌঁছে দেখলাম বাবা ততদিনে সেরে উঠেছেন, তবে শরীরটা এখনো একটু কাহিল রয়ে গেছে। বাড়ি ঘুরে ঘুরে আত্মীয়-স্বজনদের সাথে দেখা করলাম। সামান্য সাক্ষাতেই সবাই বেশ খুশী হয়েছেন বলে মনে হল। অনেকে বললেনঃ আমরা কি তোদের কাছে টাকা-পয়সা চাই, না সাহায্য চাই। মাঝে মধ্যে এসে তোরা যদি একটু দেখা করিস তা হলে মনে বড় শান্তি পাই, জোর পাই। রক্তের তো একটা টান আছে, সেটা তোরা এখন বুঝবি নারে, বুঝবি না। খবর শুনে তো অশীতিপর বৃদ্ধ এক দাদা এসে

www.pathagar.com

বারান্দার সামনের খোলা জায়গায় আমগাছের ছায়ায় চেয়ারে বসলেন। দাদাকে দেখেই বুঝলাম এবার তাঁর সাথে বেশ কিছুক্ষণ আলাপ করতে হবে। আমিও তাঁর পাশে বসলাম। দাদা সেই যৌবন থেকেই চাকুরী করতেন কোলকাতায়। অবসর নিয়ে এখন পড়ে আছেন এই গ্রামে। অনেক কথাই তিনি বললেন, দুঃখের কথাও বললেন। বললেনঃ মন খুলে কথা বলার মত লোক পাই না নাতি। প্রসঙ্গক্রমে দাদা বৃটিশ, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ আমলের কথা বললেন। বৃটিশ আমলের দিকেই যেন দাদার টানটা বেশী। বললেনঃ ঐ আমলে বিচার ছিল। এত অরাজকতা ছিল না। দাদার কথায় বাধা দিয়ে বৃটিশদের নীল চাষের কথা বললামঃ কই, নীল চাষের শোষণের বেলায়তো বৃটিশরা ঠিক বিচার করেনি। দাদা বললেনঃ ঐ একটু আধটু অবিচারতো হয়েছেই, তবুও তখনকার আমল ভাল ছিল। দাদা কিছুক্ষণ চুপ থেকে কি যেন ভেবে নিলেন। তার পর বললেনঃ হ্যাঁ, তুমি যে নীল চাষের কথা বলছো তাতো ঠিক। অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন ঐ যে মোহনপুর দেখছো; ঐখানে নীলকরদের কুঠির ছিল। আমি তখন স্কুলের ছাত্র ছিলাম। আমি নিজেই সেখানে দেখেছি নীল গাছ ভেজাবার চৌবাচ্চা। দাদা আরো কি বলতে গিয়ে যেন চুপ হয়ে গেলেন। হয়তো তিনি তখন তার সেই কৈশোর রাজ্যে হারিয়ে গেছেন। আমার মনে হলো দাদা বোধ হয় তাঁর চাওয়া-পাওয়ার রাজ্যে হিসাবে মিলাতে পারেননি। আশা ভঙ্গের কারণে বোধ হয় নিজেদের দু'টি আমলের প্রতিই তাঁর ক্ষোভটা বেশী আর এর প্রতিক্রিয়ায় ভালবাসাটা গিয়ে যোগ হচ্ছে বৃটিশ আমলের পাল্লায়। যাক এতদিন পরে দেখা হওয়ায় দাদাকে আর বেশী ঘাটালাম না।

আমি বাড়িতে শুধু দেখা সাক্ষাৎ করতেই গিয়ে ছিলাম। কোন সমস্যা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে যাইনি। তবুও বাবা বাড়ির সীমানা সঙ্কটের কথা বললেন। বললেন, কিভাবে একটু একটু করে একজন আর একজনের সীমানা ডিঙ্গাচ্ছে। আরেকটি নতুন উপদ্রবের কথা বললেন। বললেন, সরকার নতুন যে বাঁধ তৈরী করেছেন তার উপর এখন রাতে প্রায়ই হাইজ্যাক হচ্ছে। সবাই জানতো হাইজ্যাকারদের পরিচিতি। কিন্তু কেউই তেমন কিছু বলতো না। কয়েকদিন আগে মাতব্বরের বাড়ি চুরি হলে নাকি সবার টনক নড়ে ওঠে। ফলে বিচার বসে। বিচারে গ্রামের পাঁচ বাড়ির পাঁচজনকে শাস্তি দেওয়া হয় জুতার বাড়ি ও অর্থ জরিমানা। পরিচয় নিয়ে

www.pathagar.com

জানতে পারলাম, এই পাঁচজনের সবাই কর্মহীন বেকার যুবক। তাই বাবাকে প্রশ্ন করলাম: এদেরকে কোন কাজ না দিয়ে শুধু জুতো পেটা করলে কি গ্রামে চুরি ডাকাতি, আর হাইজ্যাক বন্ধ হবে?

সেদিন বাজারেই দেখা হল এই হাইজ্যাকারদের কয়েকজনের সাথে। তাদের বিনম্র আচরণ এবং কথাবার্তা শুনেতো আমার মনে হয়নি এরা শেষ হয়ে গেছে। সামান্য একটু যত্ন নিলেইতো এদের বাঁচিয়ে তোলা যায়। গ্রামের কথা বাদ দিলাম, নিজ বাড়ীর মানুষরা কি চেষ্টা করলে বাড়ির একজন তরুণকে কাজের সংস্থান করে সুপথে ফিরিয়ে আনতে পারে না! আর মাতব্বরের সামর্থের কথা নাই বা বললাম। শহরের মত গ্রামেও বোধ হয় এইসব হর্তাকর্তারা এ ধরনের ছোট খাট কাজ করতে লজ্জা পান। হয়তো ভাবেন, দুষ্কৃতিই যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে বিচার করবেন কাদের। অতএব এসব দুষ্কৃতির উৎসমুখ বন্ধ করার মত বোকামি তারা করেন কিভাবে! তাছাড়া নির্বাচন আর দলাদলির দুঃসময়ের জন্যতো এ জাতীয় তরুণদের রিজার্ভ রাখা উচিত।

বাজারেই দেখা হলো একজন মফঃস্বল সাংবাদিকের সাথে। তিনি বেশ সোৎসাহে অভ্যর্থনা জানালেন। বললেনঃ খুব মোক্ষম সময়ে আপনার দেখা পেয়ে গেলাম। আমাদের গ্রামের একটি ব্যাপার নিয়ে আপনাদের পত্রিকায় কিছু লেখার ব্যবস্থা করবেন। ব্যাপারটি খুঁটিয়ে দেখে বললাম, ঘটনার নায়ককে সমর্থন করে লিখলে তো অন্যায়কে সমর্থন করা হবে। তিনি বললেনঃ গ্রামের মর্যাদার প্রশ্ন। তাকে জিতিয়ে আনতেই হবে। দরকার হলে আমরা নিজেরা তাকে মারবো পিটবো সবকিছু করবো কিন্তু অন্যের সামনেতো আর তাকে হেয় করা যায় না।

তার কথায় যেন ভিলেজ পলিটিক্সের দর্শনটাই ফুটে উঠলে। অর্থাৎ দূরের ঘরের মোকাবেলায় কাছের ঘরকে সমর্থন, পাড়ার মোকাবেলায় নিজ বাড়ীকে সমর্থন, গ্রামের মোকাবেলায় নিজ পাড়াকে সমর্থন, ইউনিয়নের মোকাবেলায় নিজ গ্রামকে সমর্থন, আর থানার মোকাবেলায় নিজ ইউনিয়নকে সমর্থনই আসল ব্যাপার। ন্যায়-অন্যায়ের মানদণ্ড যেন সেখানে কোন ব্যাপারই নয়।

শুধু ভিলেজ পলিটিক্সের দোষ দেই কেন, বর্তমান বিশ্বের জাতীয় বা আন্তর্জাতিক পলিটিক্সও কি তার চাইতে ব্যতিক্রম কিছু?

রচনাকাল: ১৯ মে ১৯৮৫

www.pathagar.com

জেনারেশান গেপ, নাসীরুদ্দীন হোজ্জা এবং....

এই জনপদের জনগোষ্ঠীর মধ্যে জেনারেশান গেপটা বোধ হয় বেড়েই চলেছে। অবশ্য বাসার চৌহদ্দি বা পরিচিত পরিবেশে এ গেপটা তেমন অনুভব করা যায় না। কিন্তু বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান বা উচ্চ-বিত্তের আত্মীয়-স্বজনদের সংস্পর্শে এলে গেপটা বেশ ভাল করেই চোখে পড়ে।

আমাদের ভারসাম্যহীন এই সমাজে একদিকে ধনী আর দরিদ্রের মধ্যে যেমন অর্থনৈতিক গেপ বেড়ে চলেছে, তেমনি পুর্ব-পুরুষ আর উত্তর-পুরুষের মধ্যেও ভিন্ন এক গেপ বেড়েই চলেছে অব্যাহত ভাবে। তাই এখন সামাজিক বা পারিবারিক আয়োজনগুলো আর ভরে ওঠে না আন্তরিক উষ্ণতায়। আনুষ্ঠানিকতার আবরণেই যেন সব কিছু বাঁধা পড়ে গেছে।

কেউ যেন আর মন খুলে কথা বলতে পারছে না। একটা ভয় সবাইকে তাড়া করে ফিরছে। ভয়টা হলঃ আমার মনের কথাটা হয়তো তার ভাল লাগবে না অথবা তার মনের কথাটা বোধ হয় আমার ভাল লাগবে না। একই জনপদের মানুষ হয়েও মানুষদের মধ্যে আজ এতো মানবভীতি কেন? এত ব্যবধান কেন? মানুষগুলোকে কি তবে কেউ যাদু করেছে? তারা কি পারবে না আর যাদুর সে বৃত্ত ভেঙ্গে বেরিয়ে আসতে?

সে যাক। পারিবারিক বা সামাজিক আয়োজন সম্পর্কেই আমরা কথা বলছিলাম। এ সমস্ত আয়োজনে অনুষ্ঠান সর্বস্বতা যাদের ভাল লাগে না প্রায়শই তারা পড়ে যান উভয় সংকটে। তারা না যেতে পারেন, না থাকতে পারেন।এ করুণ অবস্থায় তখন তাদের কখনো হতে হয়ে নিদারুন ভাবুক, কখনো দেয়ালে টাঙানো চিত্রের সমঝদার দর্শক অথবা কখনো আশ্রয় নিতে হয় হাতের কাছের পত্র পত্রিকা বা বইয়ের পাতায়। আর আজকাল তো দেয়ালের চিত্র আর টেবিলের পত্রিকায় চোখ রাখাতে পারে না অনেকে। এ অবস্থায় অনেক অসহায় মানুষকে অগত্যা দেখা যায় দেয়ালের টিকটিকির দিকেই গভীর অভিনিবেশের সাথে তাকিয়ে থাকতে। হায়রে মানুষ! মানুষের সমাজে আজ তুমি কত অসহায়!

www.pathagar.com

আমার একথাগুলো কোন কল্পকথা নয়। আমাদের চারপাশেই ঘটে চলেছে ঘটনাগুলো। কখনো এর শিকার হন আপনি, কখনো আমি।

এইতো সেদিন আমার এক আত্মীয়ের বাড়ি গিয়ে দেখি বাসাটি রীতিমত মহিলাদের দখলে। আসর বেশ গুলজার। কেউ কেউ এসে আহবান জানালেন আসরে যোগ দিতে। ভাবটা অনেকটা এ রকমঃ 'আরে লজ্জা পাচ্ছেন কেন? সাহস থাকেতো আসর মাত করে পৌরুষের পরিচয় দিন।' ওদের আমি কি করে বুঝাই যে, মহিলাদের গুলজার আসরে না যাওয়াটাই পুরুষের জন্য সাহসের কাজ।

ড্রইংরুমে একা একা তো আর এমনি বসে থাকা যায় না। চোখ বাড়াতেই দেখলাম, হাতের কাছেই চমৎকার আঙ্গিকের একটা বই। যেন পেঙ্গুইনের প্রকাশনা। পকেট সাইজের বইটি সত্যজিত রায়ের। তবে নতুন কিছু নয়। বইটির নাম 'মোল্লা নাসীরুদ্দীনের গল্প'। বইটির মলাটে হাত রাখতেই নজরে পড়ল এক বর্ণনাঃ 'পরমান্ন যেমন মিষ্টি ছাড়া হতে পারে না। রসগোল্লা যেমন বিনা রসে তৈরি হওয়া অসম্ভব মোল্লা নাসীরুদ্দীনের গল্পের সঙ্গেও তেমনি মিশে থাকে অনিবার্য কৌতুক। প্রায় হাজার বছর ধরে পৃথিবীর নানান দেশের লোকের মুখে মুখে ফিরছে মোল্লা নাসীরুদ্দীনের গল্প। সংহত নিটোল, রসে ভরপুর এই গল্পাবলী যেন টসটসে আঙ্গুরের থোকা। জিভে ছোঁয়ালেই হাসি।'

নাসীরুদ্দীন হোজ্জার গল্পের সাথে আগেই কিছুটা পরিচিত ছিলাম। এই বর্ণনা পড়ে যেন আরো একটু প্রলুব্ধ হলাম। পাতা উল্টাতেই নজরে পড়লো ছোট্ট একটি ভূমিকা। ভূমিকার এক জায়গায় লেখা আছেঃ 'মোল্লা নাসীরুদ্দীন যে ঠিক কেমন লোক ছিলেন, সেটা তার গল্প পড়ে বোঝা মুশকিল। এক এক সময় তাকে মনে হয় বোকা আবার এক এক সময় মনে হয় ভারী বিজ্ঞ। তোমাদের কী মনে হয় সেটা তোমরাই বুঝে নিও।' এ কথা পড়ে কৌতূহলটা যেন আরো বেড়ে গেল। ঢুকে পড়লাম বইয়ের ভেতর। একের পর এক গিলতে লাগলাম গল্পের আঙ্গুর। গল্পগুলো পড়তে পড়তে মনে হল ভূমিকায় ঠিকই বলা হয়েছে। গল্পগুলো পড়ে কখনো হোজ্জাকে মনে হয়েছে বেশ বোকা আবার কখনো বেশ বিজ্ঞ। পাঠকদেরও এই বোধ থেকে বঞ্চিত করে লাভ কি? তাই শুনে নিন না হোজ্জার দুটি গল্প। প্রথমেই শুনুন চার নম্বর গল্পটিঃ নাসীরুদ্দীন তার বাড়ির বাইরে বাগানে কী যেন

www.pathagar.com

খুঁজছে। তাই দেখে এক পড়শী জিজ্ঞেস করলে 'ও মোল্লা সাহেব, কী হারালে গো'? 'আমার চাবিটা' বললে নাসীরুদ্দীন। তাই শুনে লোকটিও বাগানে এসে চাবি খুঁজতে লাগল। কিছুক্ষণ খোঁজার পর সে জিজ্ঞেস করল, 'ঠিক কোন্ খানটায় ফেলেছিলে চাবিটা মনে পড়ছে? 'আমার ঘরে।' 'সে কি! তা হলে এখানে খুঁজছ কেন?' 'ঘরটা অন্ধকার' বললে নাসীরুদ্দীন। 'যেখানে খোঁজার সুবিধে সেইখানেই ত খুঁজব।'

আর বত্রিশ নম্বর গল্পটি হলঃ নাসীরুদ্দীন নাকি বলে বেড়াচ্ছে যারা নিজেদের বিজ্ঞ বলে তারা আসলে কিছু জানে না। এই খবর শুনে দেশের সাতজন সেরা বিজ্ঞ নাসীরুদ্দীনকে রাজার কাছে ধরে এনে বললে, 'শাহে-নশা, এই ব্যক্তি অতি দুর্জন। ইনি আমাদের বদনাম করে বেড়াচ্ছেন। এর শাস্তির ব্যবস্থা হোক।' রাজা নাসীরুদ্দীনকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কিছু বলার আছে? 'আগে কাগজ-কলম আনা হোক জাঁহাপনা', বললেন নাসীরুদ্দীন। কাগজ কলম এল। 'এদের সাতজনকে একটি করে দেওয়া হোক।' তাও হল। 'এবার সাত জনে আলাদা করে আমার প্রশ্নের জবাব লিখুন।' প্রশ্ন হল, রুটির অর্থ কী? সাত পণ্ডিত উত্তর লিখে রাজার হাতে কাগজ দিয়ে দিলেন। রাজা পর পর উত্তরগুলো পড়ে গেলেন। পয়লা নম্বর লিখেছেন—রুটি এক প্রকারে খাদ্য। দুই নম্বর—ময়দা ও জলের সংমিশ্রণে তৈয়ারী পদার্থকে বলে রুটি। তিন নম্বর—রুটি ঈশ্বরের দান। চার নম্বর—এক প্রকার পুষ্টিকর আহার্যকে বলে রুটি। পাঁচ নম্বর—রুটির অর্থ করতে গেলে আগে জানা দরকার কোন প্রকার রুটির কথা বলা হচ্ছে। ছয় নম্বর—রুটির অর্থ এক মূর্খ ব্যক্তি ছাড়া সকলেই জানে। সাত নম্বর —রুটির প্রকৃত অর্থ নির্ণয় করা দুরূহ ব্যাপার।

উত্তর শুনে নাসীরুদ্দীন বললে, 'জাঁহাপনা যে জিনিস এঁরা প্রতিদিন খাচ্ছেন, তার মানে এঁরা সাতজন সাত রকম করলেন, অথচ যে লোককে এঁরা কখনো চোখেই দেখেননি তাকে সকলে একবাক্যে নিন্দে করছেন। এ ক্ষেত্রে কে বিজ্ঞ কে মূর্খ সেটা আপনিই বিচার করুন।' রাজা নাসীরুদ্দীনকে বেকসুর খালাস দিলেন।

গল্প শুনে পাঠকবর্গ ও আমার মত সমস্যায় পড়ে গেলেন কি? চার নম্বর গল্পটি শুনে তো মনে হচ্ছে হোজ্জা বেজায় বোকা। কিন্তু বত্রিশ নম্বর গল্পটি? এ গল্প শুনেতো যে কেউ বলবে হোজ্জা বেশ বিজ্ঞ।

www.pathagar.com

হোজ্জা আসলে কি—এ ভাবনায় আমি যখন বিভোর, তখন হঠাৎ করে চলে গেল লাইটটা। কোন জানান না দিয়ে টুব করে লাইটটি ডুবে গেলে কার না খারাপ লাগে। আজ কিন্তু লাইট চলে যাওয়ায় আমার ভালই লাগল। নিশ্চুপ অন্ধকারে হোজ্জা বিষয়ক ভাবনাটা বেশ গতি পেল। আমি পরিষ্কার মাথায় বুঝতে পারলাম আসলে হোজ্জা বেশ বিজ্ঞই ছিল। বোকা থাকাটা তার একটা ভান মাত্র। বোকা সেজে বোকাদের শিক্ষা দেয়াটাই ছিল বিজ্ঞ হোজ্জার আসল উদ্দেশ্য। পাঠকবর্গই বলুন, কোন বোকার পক্ষে কি বত্রিশ নম্বর গল্পের নায়ক হওয়া সম্ভব? আর একজন মানুষের পক্ষে কি একই সময় বোকা ও বিজ্ঞ হওয়া যৌক্তিক?

সে যাক। হোজ্জা সম্পর্কে সিদ্ধান্তে আসার পর মন আমার আঁকুপাঁকু করতে লাগল বইটির বাকি গল্পগুলো শেষ করবার জন্য। আমি দেয়ালের দিকে চোখ রেখে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

এক সময় লাইট এল। কিন্তু তখন লাইটের আলোতে দেয়াল থেকে আমি আর চোখ সরাতে পারলাম না। দেখলাম সেখানে আমার পরিচিত ক্যালিগ্রাফীটি (লিপিচিত্র) আর নেই। সেখানে শোভা পাচ্ছে ভিন্ন একটি চিত্র। উপহার হিসেবে ক্যালিগ্রাফীটি আমিই দিয়েছিলাম। একটি সুবর্ণ তাম্র পাত্রে লতা-পাতা বেষ্টিত আরবী অক্ষরে 'আল্লাহ' ও 'মুহম্মদ' লেখা শিল্পকর্মটি দেখতে বেশ সুন্দরই ছিল। তাই মনে প্রশ্ন জাগল—এটি সরাবার কারণ কি? অবশ্য ক্যালিগ্রাফীটি উপহার দেবারও একটি ইতিহাস আছে। ক্যালিগ্রাফীটি উপহার দেবার আগে দেয়ালের সেই নির্দিষ্ট জায়গায় শোভা পেত উলঙ্গ দুই নর-নারীর একটি চুম্বন চিত্র। প্রথমে বলেছিলাম ড্রইং-রুমে এ চিত্রটি রাখা সুরুচির পরিচায়ক নয়। জবাব এসেছে: 'মনটাকে বড় করুন, দৃষ্টিকে সুন্দর করুণ। এত সুন্দর একটি চিত্রের মধ্যে আপনি খারাপের কি পেলেন।'

আমি বললুম: চুম্বনের দৃশ্যটা সুন্দর এঁকেছে বৈকি! আমাদের একান্ত ব্যক্তিগত জীবনে তো আরো অনেক গোপন সুন্দর ব্যাপার আছে। তাই বলে কি সব-সুন্দর আমরা সবার সামনে নির্বিচারে উপস্থাপন করছি? আমরা কি কোন সীমারেখা মেনে চলছি না? আর আপনার এই চুম্বন-চিত্রের প্রকাশ্য চর্চা যদি শুরু হয়ে যায়, তখন সেটা আপনার ভাল লাগবে কি? তখন সে দৃশ্যকে আপনি সুন্দর বলবেন কি? ইউরোপবাসী বাস্তব জীবনে

www.pathagar.com

যা চর্চা করছে তাদের চিত্রকর্মেও তার প্রতিফলন ঘটছে। কিন্তু আমাদের এই চিত্রকর্ম তো ইউরোপের চিত্রকর্মের বাহ্যিক নকল মাত্র। আমাদের জীবনের সাথে তার কোন সম্পর্ক আছে কি?

এতকিছু বলার পরও কিন্তু কোন কাজ হলো না। আধুনিকতার (?) গোঁয়ার্তুমিতে সে চিত্র সেখানেই রয়ে গেল। এরপর ঘটলো এক ভিন্ন ঘটনা। একদিন নামাজের সময় হওয়াতে বললামঃ আমি এখন নামাজ পড়বো। কিন্তু তোমার এ উলঙ্গ চিত্র সামনে রেখে তো আমার পক্ষে নামাজ পড়া সম্ভব হবে না। আমার এ কথাটা কিন্তু সেদিন মন্ত্রের মত কাজ করেছে। চিত্রটি সেখান থেকে উৎপাটিতে হল। সে দিনের আমার কথাটি বোধ হয় প্রতিপক্ষের মনে কোন ভয়ের সৃষ্টি করেছিল। এরপরই কায়দা করে ক্যালিগ্রাফীটি আমি উপহার পাঠিয়েছিলাম।

সে যাক। বহুদিন পর ক্যালিগ্রাফীটির অপসারণ দেখে কারণ জানতে চাইলাম। বলা হলঃ ক্যালিগ্রাফীটির রঙটা কেমন নষ্ট হয়ে গিয়েছিল তাই একটা নতুন চিত্র টাঙালাম। আমি বুঝতে পারলাম সত্যি কথাটা বলা হয়নি। মূলত হালফ্যাশানের চিত্রটিই মানুষটিকে মুগ্ধ করে ফেলেছে, নইলে কি আর ক্যালিগ্রাফীটির তাম্রপাত্রটিতে 'ব্রাসো' দিয়ে একটু ঘষা যেতো না। তা হলেই তো আবার সেটি চক-চক করে হেসে উঠতো।

আসলে তাম্রপাত্রের মরিচা হয়তো 'ব্রাসো' দিয়ে সরানো সম্ভব, কিন্তু জীবন-দর্শনের মরিচা সরাবে কে? বস্তু-'ব্রাসো'র তো সে সাধ্যি নেই। এখানে প্রয়োজন জীবন চেতনার ব্রাসো।

জেনারেশান গেপের কথা বলছিলাম। এখানেই তো আমাদের জেনারেশান গেপের বীজ নিহিত। আসলে নৌকার জায়গায় স্পীড বোট এলে, হাত পাখার জায়গায় বৈদ্যুতিক পাখা এলে, রেডিওর জায়গায় টিভি এলে, তলোয়ারের জায়গায় মেশিনগান এলে, কলসের জায়গায় ফ্রীজ এলে জেনারেশান গেপ হয় না। জেনারেশন গেপ হয় জীবন দর্শনে গেপ হলে। তাইতো আজ পরকাল বিশ্বাসী আর অবিশ্বাসীদের মধ্যে জীবনের আচার আচরণে এত গেপ। পরকাল বিশ্বাসীরা মানবিক সীমাবদ্ধতার কারণেই হালাল-হারামের বিধান মেনে চলতে উৎসাহী। আর পরকালে অবিশ্বাসীরা বস্তুবাদে বিশ্বাসী হওয়ার কারণে বস্তু ভোগেই একালে খুঁজে পেতে চায় চরম শান্তি। কিন্তু এপথে যে শান্তি 'সোনার হরিণ', তা বোধ হয় তারা বুঝেও বুঝে

www.pathagar.com

উঠতে পারছে না। তাইতো মুসলিম সমাজ আজ নাসীরুদ্দীন হোজ্জার মত নিজ ঘরে মুক্তির চাবি ফেলে এসে বাইরে পণ্ডশ্রম করছে সে চাবির অন্বেষণে।

আর মুক্তির দর্শন খুঁজতে গিয়ে আমাদের অবস্থা হয়েছে হোজ্জার সেই সাত পণ্ডিতের মত। এখানে কারো মতের সাথে কারো মত মিলছে না। অথচ ঘরেই রয়েছে আমাদের তর্কাতীত এক ঐশীগ্রন্থ, বিশ্বনন্দিত মহানবী (সঃ) ছিলেন যার বাহক।

আজ আমাদের ভেবে দেখার সময় এসেছে, আমরা কি ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ এ পৃথিবীতে মতবাদের উত্তাল তরঙ্গে খণ্ডবিখণ্ড হয়ে ভেসে যাব, নাকি সে ঐশী জীবন-দর্শনের সুশীতল ছায়াতলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে পৃথিবীর সম্পদ আর প্রযুক্তির অন্বয়ে গড়ে তুলবো এক সুসংবদ্ধ মানব সমাজ। তাবৎ জেনারেশান গেপের সুরাহায় এটাই বোধ হয় মোক্ষম পথ।

রচনাকাল ঃ ৭ই জুলাই ১৯৮৫

www.pathagar.com

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ : লিটলবয়, ফ্যাটম্যান এবং কাংখিত শান্তি

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের তখন শেষ পর্ব। ফ্যাসিস্ট জার্মানী আত্মসমর্পণ করেছে মিত্রশক্তির কাছে। আর প্রাচ্যে হিটলারের দোসর তৎকালীন জাপানের ফ্যাসিস্ট শাসকরা তখনও যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। এমনি একটা সময়েই সেই মারাত্মক পারমানবিক বোমার অভ্যুদয় ঘটে। অবশ্য অনেকদিন ধরেই পারমাণবিক বোমার বিপুল শক্তি করায়ত্ত করার চেষ্টায় নিয়োজিত ছিল বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা। জার্মানী এবং জাপানও ছিল তার অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু সে প্রতিযোগিতায় আর সবাইকে পরাভূত করে পারমাণবিক বোমা তৈরীতে সমর্থ হল যুক্তরাষ্ট্র। ১৯৪৫ সালের ১৬ই জুলাই গোপনে সে বোমার পরীক্ষাও তার করে নিল। আর সেই পরীক্ষার মধ্যেই নিহিত ছিল হিরোশিমা ও নাগাসাকির মৃত্যুবাণ।

হিরোশিমার উপর সে মৃত্যুবাণ নেমে এসেছিল ১৯৪৫ সালের ৬ই আগস্ট সকাল সোয়া আটটায়। সেদিন মার্কিন বোমারু বিমান 'এনোলাগে' থেকে নিক্ষিপ্ত হলো পারমাণবিক বোমা 'লিটল বয়'। মুহূর্তের মধ্যেই ঘটে গেল প্রলয়কাণ্ড। বোমা বিস্ফোরণের পর পুরো ছয় ঘন্টা ধরে চলতে থাকে অগ্নিঝড়। আচমকা প্রবল বাতাস চারদিক থেকে তেড়ে আসতে থাকে জ্বলন্ত শহরের দিকে। আর তার বেগ ছিল ঘন্টায় ৫০/৬০ কিলোমিটার। গোটা এলাকায় তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় কয়েক হাজার ডিগ্রী। বিস্ফোরণের কেন্দ্রস্থলের আশেপাশের লৌহ ও অন্যান্য ধাতু গলে বাষ্প হয়ে যায়। এমনকি মাটির উপরিস্তরও গলে নেমে যায় অনেকখানি নীচে।

আর নাগাসাকিতে আণবিক বোমা বিস্ফোরিত হয় ১৯৪৫ সালের ৯ই আগস্ট সকাল ১১টা ২ মিনিটে। অর্থাৎ হিরোশিমার ৩দিন পরে। কিন্তু 'ফ্যাটম্যান' নামে প্লুটোনিয়াম বোমার টার্গেট নাগাসাকি ছিল না। আসলে

www.pathagar.com

'ফ্যাটম্যান'-এর লক্ষ্যস্থল ছিল কিইশু দ্বীপের ককুরা শহরটি। আর ঐ শহরের একটি সামরিক ঘাঁটিই ছিল তার কারণ।' ফ্যাটম্যান'-বাহী মার্কিন বোমারু বিমান বি—২৯ খারাপ আবহাওয়ার দরুন সেদিন ককুরায় আঘাত হানতে পারেনি। এভাবে খারাপ আবহাওয়ার ফলে বোমাটি নেমে আসে নাগাসাকির উপর।

ঐ দুটি বোমা বিস্ফোরণের পর মাত্র ২/৩ সেকেণ্ডের মধ্যেই হাজার হাজার মানুষ তাদের বাড়িঘর ও কর্মস্থলের সাথে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তাৎক্ষণিকভাবে প্রায় ২ লাখ মানুষের মৃত্যু হয়। পরে রেডিয়েশনজনিত কারণে মৃত্যু হয় আরো ১ লাখ লোকের। জাপানে 'লিটল বয়' ও'ফ্যাট-ম্যান'-এর শিকার যারা হয়েছিল তাদের মৃত্যু এখনো অব্যাহত রয়েছে। আর এর হার প্রতিবছর ২ হাজার।

হিরোশিমা ও নাগাসাকির উপর এই যে পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ, তার প্রয়োজন ছিল কিনা, বেসামরিক মানুষকে এমন নির্বিচারে হত্যা নৈতিক ও সামরিক দিক থেকে যৌক্তিক ছিল কিনা আজও সে প্রশ্নের বিশ্লেষণ চলছে। এক পক্ষের বক্তব্য ঃ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যখন অন্তিম পর্বে, জার্মানী যখন আত্মসমর্পন করে ফেলেছে সেই সময়ে এই পারমাণবিক বিনাশযজ্ঞের কোন যৌক্তিকতা ছিল না। বরং যুক্তরাষ্ট্র তখন এই বোমা ব্যবহার করেছিল যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে নিজের প্রাধান্য বহাল রাখতে এবং একই সাথে সোভিয়েত বলয়কে কোণঠাসা করে রাখার জন্য।

অপর পক্ষের বক্তব্য ঃ জাপানের আত্মসমর্পণ ত্বরান্বিত করার জন্য হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে বোমাবর্ষণের প্রয়োজন ছিল। জাপানের সঙ্গে যুদ্ধ আরো বেশী দিন অব্যাহত থাকলে লোকক্ষয় আরো বেশী হত। তাছাড়া বিশ্বের রণক্লান্ত মানুষ যত দ্রুত সম্ভব যুদ্ধের অবসান কামনা করছিল।

আসলে আত্মপক্ষ সমর্থনে যুক্তি খুঁজে পেতে বোধ হয় কারোই তেমন কষ্ট হয় না। তাই বাদী-বিবাদী নির্বিশেষে সবাইকে দেখা যায় যুক্তির জাল বুনতে। কিন্তু যুক্তির জাল যতই বোনা হোক না কেন, কালের বিচারে সব জাল ছিন্ন করে সত্য একদিন বেরিয়ে আসেই।

তাই আজ পৃথিবীর সাধারণ মানুষ না সমর্থন করেছে ২য় বিশ্ব যুদ্ধের ফ্যাসিস্ট শক্তিকে, না পারমাণবিক বিনাশযজ্ঞকে। তাই তো আজ পৃথিবীর মানুষ ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে, পারমাণবিক অস্ত্রের বিরুদ্ধে এতটা প্রতিবাদ-

www.pathagar.com

মুখর। ব্রাসেল্‌স, রোম, মাদ্রিদ, লণ্ডন, কোপেন হেগেন, ভিয়েনা, স্টক-হোম, বন সহ পৃথিবীর ছোট-বড় হাজারো শহরে চলছে লাখ-লাখ মানুষের সমাবেশ, যুদ্ধবিরোধী বিক্ষোভ। হিরোশিমা-নাগাসাকিতে আণবিক বোমা বর্ষণের পর আজ চল্লিশ বছর কেটে গেছে। কিন্তু এই ৪০ বছরে মানব জাতির উপর পারমাণবিক বোমার কালোছায়া দূরীভূত না হয়ে তা আরো ঘনীভূত হয়েছে। আজ পৃথিবীতে ৫০ হাজারেরও বেশী পারমাণবিক অস্ত্র রয়েছে। বলা বাহুল্য, এসব অস্ত্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অস্ত্রের চাইতে অনেক বেশী শক্তিশালী। রাজকীয় সুইডিশ বিজ্ঞান একাডেমীর এক হিসেবে দেখা গেছে, পারমাণবিক যুদ্ধ শুরু হলে মারাই যাবে ৭৫ কোটি মানুষ। গত বছর বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা তার পরিসংখ্যানে জানিয়েছেঃ পারমাণবিক যুদ্ধে হতাহতের সংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় দুই শ' কোটি যার অর্ধেক মারা যাবে পার-মানবিক বিস্ফোরণের পরপরই। তাহলে প্রশ্ন জাগতে পারেঃ মানুষ যেখানে পারমাণবিক যুদ্ধের বিরুদ্ধে এত প্রতিবাদ মুখর, সেখানে এতো পারমাণবিক আয়োজন হয় কিভাবে? এ প্রশ্নের পিঠেই প্রশ্ন আসেঃ সাধারণ মানুষ আর সাধারণ দেশ কি এই পারামাণবিক অস্ত্রের আয়োজন করছে, নাকি তার পেছনে রয়েছে পরাশক্তি আর পরামানবরা?

মানবজাতির উপর পারমাণবিক বিপর্যয়ের কালোমেঘ লক্ষ্য করে বিশ্ব বিজ্ঞানকর্মী ফেডারেশনের সভাপতি পদার্থ বিজ্ঞানী ফ্রেডরিক জুলিওকুরী ১৯৫৫ সালের ৩১শে জানুয়ারী প্রখ্যাত দার্শনিক বার্ট্রাণ্ড রাসেলের কাছে একটি চিঠি লেখেন। ঐ চিঠিতে তিনি পারমাণবিক বিপর্যয় প্রসঙ্গে বিজ্ঞা-নীদের একটি যৌথ বিবৃতি প্রণয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। জুলিও কুরীর প্রস্তাব অনুসারে বার্ট্রাণ্ড রাসেল রচনা করেন এক ইশতেহার। এই ইশতেহারে ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক শিবিরের প্রধান প্রধান বিজ্ঞানীরা স্বাক্ষর করেন। ইশতেহারে প্রথম স্বাক্ষর করেন মহান বিজ্ঞানী আইনস্টা-ইন। পরে জুলিওকুরী, মাক্‌স বোর্ন, লিনাস পলিং প্রমুখ বিজ্ঞানীরা তাতে স্বাক্ষর করেন।

১৯৫৫ সালের ৯ই জুলাই লণ্ডনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বার্ট্রাণ্ড রাসেল এই বিবৃতি পাঠ করেন। ঐ বিবৃতি পরবর্তী পর্যায়ে শান্তি ও নিরস্ত্র করণের লক্ষ্যে পুগওয়াশ আন্দোলনের জন্ম দেয়। ঐ বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়ঃ 'মানুষ হিসেবে আমরা মানুষের কাছে আবেদন জানাচ্ছি—মনুষ্যত্বের

www.pathagar.com

কথা স্মরণ করুন, বাকীটুকু ভুলে যান।' এতে আরো বলা হয়ঃ পৃথিবীতে জীবনের সংরক্ষণের জন্য মানবজাতির প্রতিনিধি হিসেবে আমাদের "নতুন ভাবে চিন্তা-ভাবনা করতে শিখতে হবে" এবং যুদ্ধরোধ ও অস্ত্র প্রতিযোগিতা বন্ধ করার জন্য বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

এই ইশতেহারের পর মহাকালের গর্ভে বিলীন হয়েছে আরো ৩০টি বছর। কিন্তু আমরা যুদ্ধরোধ ও অস্ত্র প্রতিযোগিতা বন্ধের ব্যাপারে কতটা বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পেরেছি?

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর গত ৪০ বছরে কোন পারমাণবিক যুদ্ধ সংঘটিত না হলেও বিভিন্ন সশস্ত্র সংঘর্ষে প্রায় ২ কোটি ১০ লাখ লোক প্রাণ হারিয়েছে। অথচ হিরোশিমা-নাগাসাকির পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণে তাৎক্ষণিকভাবে নিহত হয়েছিল মাত্র ২ লাখ মানুষ। গত ফেব্রুয়ারীতে জাতিসংঘের এক রিপোর্ট বলা হয় যে, ১৯৮৩ সালে প্রায় ৭৫টি দেশের ৪০ লাখ সৈন্য লড়াই ও সংঘর্ষে লিপ্ত ছিল।

বিশ্ব সামাজিক অবস্থার উপর প্রকাশিত রিপোর্টে বলা হয়ঃ ১৯৮৩ সালে পৃথিবীতে ছোট-বড় ৪০টি সংঘর্ষ ঘটে এবং ৮টি দেশের সৈন্য অপর দেশের মাটিতে যুদ্ধে লিপ্ত হয়।

রিপোর্টে বলা হয়ঃ ১৯৪৫ সালের পর থেকে বিভিন্ন সংঘর্ষে এপর্যন্ত প্রতিমাসে গড়ে ৩৩ থেকে ৪১ হাজার মানুষ মারা গেছে। বেশীর ভাগ হতাহতের ঘটনা ঘটেছে উন্নয়নশীল দেশসমূহে। তবে উন্নত দেশগুলোও প্রচুর ক্ষয়-ক্ষতির শিকার হয়েছে।

আর একথা তো আজ আমাদের কাছে দিবালোকের মত স্পষ্ট যে, যুদ্ধের ময়দানে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে দেখা গেলেও তার পেছনে নিয়ন্ত্রক শক্তি হিসেবে কাজ করছে উন্নত দেশ ও পরাশক্তিগুলো। কোন কোন দেশের মাটিতে তো পরাশক্তিগুলো নিজেদের সৈন্যনামিয়ে দিয়েছে। আফগানিস্তানের কথাই ধরুন। সেখানে সোভিয়েত ইউনিয়ন চালিয়ে যাচ্ছে নির্বিচার হত্যাকাণ্ড। সম্প্রতি প্রত্রিকায় প্রকাশিত একটি খবরে জানা গেছে যে, সোভিয়েত বাহিনী ১৬টি আফগান গ্রাম ধ্বংস করেছে এবং সেখানকার সকল অধিবাসীকে হত্যা করেছে। তাহলে পুগওয়াশ আন্দোলন কি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল? পরাশক্তিগুলো কি তাহলে মানুষের আর্তিতে কর্ণপাতই করবে না?

www.pathagar.com

হিরোশিমা ঐ নাগাসাকিতে আণবিক বোমা বর্ষণের শিকার হয়েও যারা বেঁচে আছেন তাদের মনেও বোধ হয় পরাশক্তি গুলোর কর্মকাণ্ডে প্রশ্নের উদ্রেক হয়েছে। এদের সংগঠন 'জাপানীজ ফেডারেশন অব অর্গানাই-জেশন অব ভিকটিমস অব অ্যাটমিক বম্বিংস' হোয়াইট হাউজে পেশ কৃত এক স্মারকলিপিতে বলেঃ হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে আণবিক বোমা বর্ষিত হওয়ার ৪০তম বার্ষিকীর বছরে আমরা যারা সেই ট্র্যাজেডীর সাক্ষী হয়ে বেঁচে আছি, পৃথিবীর সকল মানুষের মতোই আশা করবো যে আপনি মিঃ প্রেসিডেন্ট, ভবিষ্যত পারমাণবিক বিপর্যয় রোধের লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। উল্লেখ্য যে, সোভিয়েত নেতৃবৃন্দের প্রতিও তারা অনুরূপ আহবান জানান।

তাদের এই আহবান পরাশক্তির মর্মে কতটুকু প্রবেশ করবে জানি না, তবে এখনো যে পারমাণবিক যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি তারো একটা কারণ আছে বৈকি। বৃহৎশক্তিগুলো জানে যে, পারমাণবিক অস্ত্রধর শক্তিগুলোর মধ্যে সংঘর্ষ গোটা বিশ্বের জন্যই মরণ ডেকে আনবে। এই বোধই তাদের কিছুটা সংযত রেখেছে। অন্যভাবে বলা যায়, ভীতির ভারসাম্যই আজো পৃথিবীটাকে টিকিয়ে রেখেছে। কিন্তু নৈতিক মূল্যবোধ বিবর্জিত এই ভারসাম্য যে এক দিন ভেঙ্গে পড়বে না তার নিশ্চয়তা দেবে কে?

যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন 'টাইম' পত্রিকার সাথে এক সাক্ষাৎকারে উল্লেখ করেনঃ ক্ষমতায় থাকাকালে আমি অন্তত চারবার পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের কথা ভেবেছিলাম। তবে রক্ষা যে, তিনি তা ব্যবহার করেননি শেষ পর্যন্ত। কিন্তু আমেরিকা বা রাশিয়ার কোন সরকার যে ভবিষ্যতে তা ব্যবহার করবে না তার গ্যারান্টি কি?

আসলে অতীতের মত আজকের পৃথিবীতেও সংঘর্ষের মূলে রয়েছে প্রাধান্যের প্রতিযোগিতা। ব্যক্তির উপর ব্যক্তির, রাষ্ট্রের উপর রাষ্ট্রের প্রাধান্যের এই যে মোহ, তার শেষ কোথায়? এরকি কোন সমাধান নেই?

আমার তো মনে হয় বিশ্বনবীর ঘোষিত 'কলেমা'র বাণীর মধ্যেই এই সমস্যার সমাধান নিহিত রয়েছে। মানুষের উপর মানুষের নয়, রাষ্ট্রের উপর রাষ্ট্রের নয়, সবার উপর স্রষ্টার প্রাধান্যই তো এই কলেমার মূল কথা।

www.pathagar.com

সমগ্র বিশ্ব ও মানবজাতির স্রষ্টা এক আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও প্রাধান্য যদি আমরা স্বীকার করে না নেই, তা হলে অব্যাহত প্রাধান্যের প্রতিযোগিতা থেকে আমাদের বিরত রাখবে কে? পারমাণবিক ধ্বংস যজ্ঞের পুনরাবৃত্তি থেকে আমাদের রেহাই দেবে কে?

প্রতিবছর ৬ই আগস্ট সকালে হিরোশিমার স্মৃতিসৌধে গিয়ে মানুষ যে উচ্চারণ করেঃ "শান্তিতে ঘুমাও, এই ভুল পুনর্বার ঘটবে না"---

এই প্রতিশ্রুতির সম্মান রক্ষার্থেই বোধ হয় মানবজাতির আবার স্রষ্টার প্রাধান্যকেই স্বীকার করে নেয়া উচিত।

রচনাকালঃ ১১ই আগস্ট ১৯৮৫

www.pathagar.com

গভীর রাতের টেলিফোন

গভীর রাতে হঠাৎ ক্রিং ক্রিং করে টেলিফোনটা বেজে উঠলো। ঘুম জড়ানো চোখ দুটি ডলতে ডলতে ভাবতে লাগলামঃ এ অসময়ে আবার ফোন করলো কে? রিসিভারটি কানে লাগাতেই বাতাসের কেমন একটা সোঁ সোঁ আওয়াজ কানে এসে ধাক্কা খেল। পরক্ষণেই দূরের অথচ স্পষ্ট একটা কণ্ঠস্বর ভেসে আসল। ছোট ভাইটি ফোন করেছে সুদূর নরওয়ে থেকে। ফোনে জানালঃ ১৮ই মার্চ এরোফ্লট-এস ইউ ৫৪৯-এ বিকেল পৌনে পাঁচটায় ঢাকা পৌঁছবে। খবরটা পেয়ে মনটা কেমন খুশী খুশী হয়ে উঠলো। বহুদিন পর ভাইটির সাথে দেখা হবে, শুধু তাই নয়, ওর নরওয়েন স্ত্রীটির গর্ভজাত তিন মাসের কন্যাটি দেখতে কেমন হয়েছে সে কৌতূহলও মিটবে এবার। এ খুশীর খবরটি সরবরাহে টেলিফোনটি কোনরকম বিভ্রাট না করায় মনে মনে ওকে একটু ধন্যবাদও জানালাম। কারণ, ক'দিন ধরে এই ঢাকাতেই টেলিফোন যোগাযোগে যে বিরক্তির শিকার হচ্ছিলাম তাতে সুদূর নরওয়ের সুচারু টেলিফোন প্রাপ্তিটা একটা অতিরিক্ত আনন্দের ব্যাপার বৈকি। ক'দিন ধরে টেলিফোনটার হাল হয়েছে এই যে, রিসিভার কানে লাগিয়ে কাউকে নাম্বার ঘুরাবার আগেই অপর প্রান্ত থেকে প্রশ্ন করা হয়—কে বলছেন? জবাবে বলতে হয়ঃ আরে ভাই আমিতো এখনো রিং করিনি, এরি মধ্যেআপনি জিজ্ঞেস করছেন-কে বলছি? ভদ্রলোক তখন বলে ওঠেনঃ ভাই রিসিভারটা রেখে আমাকে একটু কথা বলতে দিন। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর হয়তো ফোন করার সুযোগ পেলাম। কিন্তু কথা বলতে গিয়ে দেখি আমাদের কথোপকথনের মধ্যে আবার অপর কোন রসিকজন হাজির হয়ে গেছেন। তিনিও দিব্যি আমাদের সাথে আলাপ চালিয়ে যাচ্ছেন। বলুন, এরপরও কি রিসিভারটা আর কানে লাগিয়ে রাখতে ইচ্ছে হয়? একে কি বলবো, ক্রস-কানেকশন না অন্য কিছু। যাক, নরওয়ের সাথে টেলিফোন আলাপে যে এরকম কিছু ঘটেনি তার জন্য টেলিফোন কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ। তবে ঢাকার আলাপেও যদি ক্রস কানেকশনের আপদকে ক্রস করতে পারেন তাহলে কর্তৃপক্ষকে সাধুবাদ জানাতে কার্পণ্য করবো না।

www.pathagar.com

টেলিফোনের সন্দেশটি হজম করতে করতে ভাবলাম, বাসার অপরাপর ঘুমন্ত সদস্যদের কাছেও সন্দেশটি এখনি পৌঁছাবো কিনা। গিন্নী বললোঃ খবরটি তরতাজা পৌঁছানোই ভাল, বাসি করে লাভ কি। খবর পেয়ে সেই গভীর রাতেই বাসায় কেমন একটা সাড়া পড়ে গেল। অনেকেই নতুন বাবুটি অর্থাৎ শিশু কন্যাটি দেখতে কেমন হবে তার একটি বর্ণনা নিজ নিজ অভিজ্ঞান থেকে দেওয়া শুরু করলো।

খবর পেয়েতো খুশী হলাম কিন্তু সে খুশীর মানুষগুলোকে বিমান বন্দর থেকে আনবো কেমন করে। দূরতো আর কম নয়। আমরা না হয় বাস কোষ্টার করে বিমান বন্দরে পৌঁছলাম, কিন্তু ওরা আসবে কেমন করে। ওরাতো প্রাইভেট কারে অভ্যস্ত। তাছাড়া তিন মাসের শিশুকে তো আর কোষ্টারের ভীড়ে উঠানো যায় না। অতএব আমি লেগে গেলাম গাড়ীর খোঁজে। কিন্তু বরাত খারাপই বলতে হবে। কেউ জানালেন, গাড়ী রিকুই জিসানের কবলে পড়েছে। কেউ জানালেনঃ গাড়ীর হয়েছে এক্সিডেন্ট। অতএব আমি একটু বিমর্ষ হয়ে পড়লাম। একেই বোধ হয় বলে মধ্য-বিত্তের সমস্যা। সাধ ও সাধ্যির কোন মিল হবে না। এই টানাপোড়েনে মধ্যবিত্তের মানসভূমি থাকে সব সময় দ্বন্দ্বযুক্ত। এই দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত খুব কম জনই হতে পারেন। আমার যখন এই অবস্থা তখন আমার এক মধ্যবিত্ত আত্মীয় বললেনঃ কি হবে আর গাড়ী খুঁজে। তোমার তো আর নিজের গাড়ী নেই যে গাড়ী নিয়ে না গেলে তোমার ভাই আর বিদেশী ভাই বোটি মাইণ্ড করবে। তোমরা বাসকোষ্টারে চলে যাও। আসার সময় ওদের একটা বেবী ট্যাক্সি ভাড়া করে নিয়ে আসলেই চলবে। সামর্থ্যের বেশী ভেবে কোন লাভ নেই। সংকটের বিহ্বলতায় তখন আত্মীয়ের কথা গুলো আমার কাছে বেশ মোক্ষম বলেই মনে হলো। সংকট মুক্ত হয়ে আমার মনে হলোঃ মধ্যবিত্ত মানসিকতাও বোধ হয় আমাদের একটা জাতীয় সমস্যা। মধ্যবিত্তের টানাপোড়েনে আমরা সব সময় অস্বাভাবিক একটা রশি বেয়ে উপরে উঠতে চাই। এই উপরে উঠতে গিয়েই তো আমরা করে বসি হাজারো অন্যায়। কখনো বা সচেতন মানুষের কাছে হয়ে উঠি হাসির পাত্র। সামর্থ্যের সীমানায় থেকেও যে সমস্যা সমাধান করা যায় তা যেন আমরা ভুলে যাই। এর ফলেই আমাদের মধ্যে দেখা দেয় হীনমন্যতা ও অন্যায় প্রবণতা। এই হীনমন্যতার জন্য আমরা নিজেদের

www.pathagar.com

প্রতি হতে পারি না শ্রদ্ধাশীল, তেমনি অপরের চোখেও আমরা হই হেয় প্রতিপন্ন। সম্প্রতি এমনি ধরনের একটি ঘটনা ঘটেছে সৌদী আরবে। ঘটনার নায়কের মুখেই তাহলে বর্ণনাটি শুনুনঃ "আমরা চাকরী করি জুবায়েল বাণিজ্যিক বন্দরের প্রশাসনিক ভবনে। এখানে অন্তত ১৫টি দেশের লোক কাজ করে। সুতরাং কথাবার্তার মাধ্যম হচ্ছে মূলতঃ ইংরেজী। আমার অফিসের মুখোমুখি যে অফিসটি তাতে বসেন একজন বৃটিশ স্থপতি। একদিন আমি একটি চিঠি পেলাম বাংলাদেশ থেকে। লিখেছে আমার এক বন্ধু। চিঠিটা লেখা ছিল সম্পূর্ণ ইংরেজী ভাষায়। আমি চিঠিটা পড়ছিলাম। তা দেখে ইংরেজ স্থপতি ভদ্রলোকটি আমায় জিজ্ঞেস করলেন, এটা কি তোমার কোন বিদেশী বন্ধু লিখেছে? আমি জবাবে বললামঃ না, বাংলাদেশী বন্ধুই লিখেছে। ভদ্রলোক বেশ আশ্চর্য হয়ে জানতে চাইলেনঃ বাংলাদেশী বন্ধু হলে ইংরেজীতে লেখা চিঠি এলো কেন? আমি হেসে তাঁকে বললামঃ এমনি হয়তো। ভদ্রলোক নাখোশ হয়ে মন্তব্য করলেনঃ আসলে তোমাদের জাতীয় অনুভূতি খুব কম। অথচ আমরা শুনেছি, তোমরা নাকি ভাষার দাবীতে রক্ত দিয়েছ, যেটা ইতিহাসে বিরল।

তারপরও আমি সে বন্ধুকে তার চিঠির জবাব বাংলাতে লিখতে পারিনি, মধ্যবিত্ত মানসিকতার কারণে। কারণ বন্ধুটি যদি মনে করে আমি ইংরেজী জানি না। সুতরাং আমাকেও ইংরেজীতেই লিখতে হল।"

একই বোধ হয় বলে মিডলক্লাস-কমপ্লেক্স। সে যাক, মিডল ক্লাস কমপ্লেক্স থেকে আল্লাহ বোধ হয় আমাকে রেহাই দিয়েছেন। তাই আমার সে আত্মীয়ের পরামর্শ অনুযায়ী আমরা বাস কোষ্টারে করে বিমান বন্দরে যাওয়ার মনস্থ করলাম। আর মেহমানদের জন্য চিন্তা করলাম বেবীটেক্সী।

নির্দিষ্ট সময়ে বিমান অবতরণ করলো। এক ফাঁকে ভাইটি দরজায় উঁকি দিলে নিশ্চিত হলাম যে ওরা ঠিকই এসেছে। কাষ্টম চেকিংয়ের পর ওরা বেরিয়ে আসলে কুশল বিনিময় হল। কিন্তু শিশুটিকে মা বা বাবা কারো কোলে না দেখে মনে প্রশ্নের সৃষ্টি হলঃ তা হলে কি ওরা শিশুটিকে সাথে আনেনি? প্রশ্ন করায় ভাইবৌটি একটি কফিনের মত বাক্সের দিকে ইশারা করলো। সেদিকে লক্ষ্য করে দেখলাম, মোটা কাডের কাপড়ের একটা বাক্সের ভিতর একটি ছোট শিশুর মুখ দেখা যাচ্ছে। আশ্বস্ত হলাম এই ভেবে যে, তাহলে ভাইজিটিকে দেখার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হতে হবে না।

www.pathagar.com

কিন্তু এ কি রকম ব্যাপার? কোথায় শিশুটি থাকবে মায়ের বুকের ভিতর, কিন্তু তা নয়—শিশুটির স্থান হয়েছে বাক্স প্যাটরার ভেতর। বস্তু আমাদের অনেক সহযোগিতা করে বটে, কিন্তু সব চাহিদা কি বস্তুতে মেটানো সম্ভব? মায়ের বুকের উষ্ণ আদর বাক্সটি কোত্থেকে দেবে শিশুটিকে। হায়রে পাশ্চাত্য সভ্যতা! তুমি মানুষকে দিয়েছ বেগ কিন্তু কেড়ে নিয়েছে আবেগ।

সে যাক, শিশুটিকে বাক্সের মধ্যে একটা পণ্যের মত বহন করে ওরা বাইরে বেরিয়ে আসল। আমরাও বেরিয়ে এসে বেবী ট্যাক্সির খোঁজ করতে লাগলাম। এমন সময় এক তরুণ এসে জিজ্ঞেস করলঃ বিকল্পের ট্যাক্সি লাগবে? বিকল্প সম্পর্কে আগেই শুনেছিলাম। তাই কৌতূহলী হয়ে ভাড়া জিজ্ঞেস করলাম। ওদের ব্যবহার এবং যৌক্তিক ভাড়ার অঙ্ক শুনে ট্যাক্সিতে যাওয়াই ঠিক করলাম। সোনালী ব্যাঙ্কের 'বিকল্প' প্রকল্পের চিন্তাধারা আসলেই প্রশংসাযোগ্য। এই ধরনের সুবিবেচিত আরো প্রকল্প গৃহীত হলে মধ্যবিত্তরা বোধ হয় অনেক অসুবিধা থেকেই বেঁচে যেতে পারতো।

সে যাক, পরে আলাপ প্রসঙ্গে ভাইবৌটিকে জিজ্ঞেস করলামঃ আমাদের দেশটিকে তোমার কেমন লাগছে। সে প্রথমেই বললোঃ তোমাদের এই যে পরিবার প্রথা তা আমার খুব ভাল লাগছে। এখানে তোমারা মা-বাবা, ভাইবোন নিয়ে কি সুন্দরভাবে মিলেমিশে আছ। সবাই সবার কাজে লাগছে, ছোটরা বড়দের বড়রা ছোটদের। কিন্তু ইউরোপে আমাদের পরিবারগুলো ভেঙ্গে যাচ্ছে। সেখানে আমরা সব বহির্মুখী। সন্তানের মা হতে এখন আর মহিলারা তেমন উৎসাহ বোধ করে না। ক্লাব আর সোসাইটি আমাদের শেষ করে দিয়েছে। তুমি বিশ্বাস কর, পাহাড়ের উপর আমাদের নির্জন বাড়ীটিতে আমারা মা-বাবা মাত্র দু'দিন এসেছিল আমার মেয়েটিকে একটু দেখতে। ব্যাস, তারপর আর খবর নেই। এখন আমাদের হয়েছে দুর্ভোগ। তোমার ভাই যায় চাকুরীতে, আমার আছে স্কুল। এখন এই শিশুটি নির্জন বাড়িটিতে একা একা থাকবে কিভাবে? সেখানেতো তোমার মার মতো থাকবে না কোন গ্র্যাণ্ডমাদার। তাই আমার স্কুল বন্ধ। আমার ইচ্ছা, ওকে তোমাদের কাছে রেখে যাই। কিন্তু ওযে খুব ছোট্ট। আগামীবার আসলে ওকে তোমাদের কাছেই রেখে যাব। পরিবার বিহীন নিরানন্দময় পরিবেশে অতিব্যস্ত সমাজে ও ভালভাবে বেড়ে উঠতে পারবে না। আমার বারবার মনে হয়, সাদা কাপড়ে আবৃত আমার সেই ধীরস্থির গ্র্যাণ্ডমাদারদের

www.pathagar.com

সময়টাই বোধ হয় ভাল ছিল। আমার সেই গ্র্যাণ্ডমাদারের কিছুটা ছোঁয়া যেন তোমার মার কাছে এসে পেলাম। এতো গতি, এতো ব্যস্ততা আমার আর ভাল লাগে না। তাই কিছু উপার্জন করে এক সময় আমরাও চলে আসবো তোমাদের দেশে, আর ফিরে যাব না কোথাও।

ওর আবেগ আপ্লুত কথাগুলো শুনতে শুনতে আমার বার বার মনে পড়ছিল ইসলামের পারিবারিক ব্যবস্থার কথা। আমি ওকে বললামঃ ইসলামে কিন্তু পরিবারকেই সমাজ ব্যবস্থার বেসিক ইউনিট হিসেবে ধরা হয়েছে। কারণ পরিবারই হবে সমাজ ব্যবস্থা দাঁড়িয়ে থাকার মূল ভিত্তি। এক হিসেবে ধরতে গেলে পরিবার হলো একটা মিনি-স্টেট। এখানে অর্থ-নীতি শিক্ষানীতি সমাজনীতি সব কিছুরই চর্চা হতে পারে। আসলে একটি সুস্থ পরিবার একটি সুস্থ রাষ্ট্রের পূর্বশর্ত। যেখানে সমাজের বেসিক ইউ-নিট পরিবার ভেঙ্গে যায়, সেখানে রাষ্ট্র ঠিক থাকবে কেমন করে। আজকে তোমাদের পরিবার ব্যবস্থা যেমন ভেঙ্গে পড়েছে, তেমনি আমাদের পরিবার প্রথায়ও চলছে নানা অনুপ্রবেশ। ফলে আমাদের পরিবার গুলোও আজ হয়ে পড়েছে অসুস্থ। আজকেতো আমরা সবাই রাষ্ট্রের শান্তির কথা, বিশ্বের শান্তির কথা বলছি। কিন্তু পরিবারের কথা কেউ বলছিনা। আসলে বিশ্বের দিকে গভীরভাবে লক্ষ্য করলে আমরা বুঝতে পারবো, কতগুলো পরিবার নিয়েই কিন্তু আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্র। আবার এই সমগ্র পৃথি-বীর নীরিখে রাষ্ট্রগুলো ও এক একটি পরিবার। তাই রাষ্ট্র ও বিশ্বব্যবস্থা ঠিক করার আগে আমাদের ঠিক করতে হবে পরিবার। কারণ পরিবারই হলো বিশ্ব সভ্যতার মূল ইউনিট। সচেতন মুসলিমরা আজ এ পথেই কাজ করে যাচ্ছে।

আমার কথাগুলো ও গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনে যাচ্ছিল। আর মাঝে মাঝে ওর বুক থেকে বেরিয়ে আসছিল দীর্ঘ নিশ্বাস। আমার কথা শুনে পিতা-মাতার স্নেহ-বঞ্চিত এই ইউরোপীয় মহিলার মনে হয়তো জেগে উঠছে নতুন স্বপ্ন। সে হয়তো বিশ্বাস করছে তার নতুন ধর্ম ইসলামই পারবে মানুষকে আবার পরিবারের শীতল ছায়ায় আশ্রয় দিয়ে বিশ্বে কাংখিত শান্তির সমাজ গড়তে। কিন্তু আমরা মুসলমানরা কি ওর বিশ্বাসকে মূল্য দিতে যথার্থভাবে এগিয়ে আসবো?

রচনাকাল ঃ ২৪ শে মার্চ ১৯৮৫

www.pathagar.com

বউ ভাড়া আর ফ্যাশন শো'র কথা

পশ্চিম জার্মানীর একটি নৈশ ক্লাব। সেখানে নগ্ন হয়ে সুন্দরীরা নাচে। আর পর্ণোগ্রাফিক ছায়াছবির প্রদর্শনীও সেখানে চলে নির্বিঘ্নে। সে নৈশ ক্লাবটিতে গিয়ে মদ খেয়েছেন এবংএতে কানাডার নিরাপত্তা লংঘিত হয়েছে, গুরুতর এই অভিযোগের পর প্রতিরক্ষামন্ত্রী রবার্ট কোটস তড়িঘড়ি করে মন্ত্রীত্ব থেকে ইস্তফা দেন।

সম্প্রতি 'দি অটোয়া সিটিজেন' পত্রিকাটি মন্ত্রীর নৈশ বিহারের কাহিনী ফাঁস করে লিখেছেঃ নভেম্বরে ঐ সফরের সময় কোটস মদ খেতে খেতে দু'ঘণ্টা ধরে একজন নগ্ন নর্তকীর সাথে আলাপ করেছেন এবং মন্ত্রীর দু'জন সঙ্গী অপর দু'জন মহিলাকে নিয়ে ক্লাবের অন্য একটি অংশে উধাও হয়ে গিয়েছিলেন। বেচারা কোটসের বরাত খারাপই বলতে হবে। পাশ্চাত্যে নৈশক্লাবে কেইবা না যায়। আর নৈশক্লাবে গেলে নারী নিয়ে একটু রং-তামাসা না করলে কি চলে! তা নিয়ে অভিযোগ করার বা পত্র-পত্রিকায় এত রিপোর্ট লেখার কি আছে! আমাদের দেশেতো বোধ হয় একেই বলে, "সব মাছে শুখায় দোষ পড়ে ঘাউরা মাছের।"

কপাল মন্দ আর কাকে বলে। নইলে কি আর সে বিজ্ঞাপনটি কোটস সাহেবের নজরে পড়তোনা। হ্যাঁ, আমি সেই 'বউ ভাড়ার' বিজ্ঞাপনটির কথাই বলছি। এই 'বউ ভাড়া'র বিজ্ঞাপনটি দিয়েছে ভ্যানকুয়েভারের (বৃটিশ কলম্বিয়া) একটি অদ্ভুত সংস্থা। সংস্থাটির নাম 'সব কিছু তবে ----।' যে সব অবিবাহিত পুরুষ ঘরের কাজ কর্ম থেকে রেহাই পেতে চায় তাদের কাছে এই সংস্থা 'বউ ভাড়া' দেবে।

এ বউ আদেশ পালন, রান্নাবান্না করা, ঘর সাজানো ও গৃহস্থালির অন্যান্য কাজ-কর্ম করবে। ভোজসভা বা সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে এরা হবে অতিথি সেবিকা। সংস্থাটির শ্লোগান 'কোন কিছু অথবা প্রায় সব কিছুর জন্যে আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত।' অভিজ্ঞজনরা বলেন, মাত্রার হেরফেরে আর আবেগের গাঢ়তায় প্রায় সবকিছু থেকে 'প্রায়' বাদ যেতে আর কতক্ষণ। সে যাক, আমাদের দুঃখ কোটস সাহেবের জন্যই। 'বউ

www.pathagar.com

ভাড়া'র বিজ্ঞাপনটি নজরে পড়লে বোধ হয় বেচারাকে মন্ত্রীত্ব থেকে পদ-ত্যাগের মত এরকম বিপাকে পড়তে হতো না। বউ ভাড়া করে নিয়ে নিজ ঘরেই আসর গুলজার করতে পারতেন। তাতে 'ঘরেবাইরে' সবই ঠিক থাকতো। 'বউ ভাড়া' নামক এসব ক্রীত দাসীদের জন্য আর কেই বা কথা বলতে আসতো?

আসলে পাশ্চাত্যের 'নৈশক্লাব' আর এই 'বউভাড়া'র ঘটনা বর্তমান বিশ্ব সভ্যতার কোন নতুন ঘটনা নয়। এরকম ঘটনা বিভিন্ন দেশে অহরহই ঘটে চলেছে। এ সমস্ত ঘটনা তখনই খবর হয়, যখন ঘটনার সাথে জড়িত থাকেন কোন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব বা থাকে নতুন কোন চমক। এ সমস্ত ঘটনার জন্য আলাদাভাবে নৈশ ক্লাব বা কোন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। এর মূলে প্রোথিত রয়েছে ভুল জীবন দর্শনের লালসা। পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী ও ভোগপ্রধান জীবন দর্শনই নৈশক্লাব, পর্ণোক্লাব আর 'বউভাড়া'র মত বিকৃতির জন্য দায়ী। আমাদের যে জীবন দর্শন, সেখানে তো নারী হলো মাতা, জায়া আর ভগ্নীর জাতি। তাঁরা আমাদের শ্রদ্ধা, ভাল-বাসা আর স্নেহের আকর। আমাদের বিশ্বাসে নারীরা ভোগের পুতুল নয়। তারাও মানুষ হিসেবে পুরুষের মত সমান মর্যাদার অধিকারী।

কিন্তু আমাদের যে জীবন দর্শন তা কি অটুট আছে? আমাদের মূল্য বোধে কি পাশ্চাত্যের অপসংস্কৃতির নোনা জায়গা করে নেয়নি? আমাদের সমাজে শিক্ষা-দীক্ষা ও অর্থ-সম্পদে প্রাগ্রসর ব্যক্তিরা তো আজকাল পাশ্চা-ত্যের ভোগবাদী জীবন দর্শন রপ্ত করে আধুনিক হয়ে উঠছেন। আর জীবনদর্শনের এ লেলিহান আগুন সংস্কৃতি আর ব্যবসায়িক স্বার্থবুদ্ধির সলতে বেয়ে গ্রাস করে নিচ্ছে সবকিছু।

সেদিন শিশুদের একটি অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম বিশেষ আগ্রহ নিয়ে। অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ ছিল পঙ্গু-শিশুদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের শুরুতে অনেক আশা আকাংখার কথা বলা হলো। তারপর সঙ্গীতা নুষ্ঠানের শুরুতে জনৈকা মহিলা একটি পঙ্গু শিশুকে ষ্টেজে তুলে দিলেন গান-গাওয়ার জন্য। ষ্টেজে ছেলেটির পোশাক দেখে আমার সার্কাসের কথা মনে পড়ে গেল। যাক, বিশেষ ভঙ্গিতে শিশুটি গান শুরু করলো। কিন্তু গানটির প্রথম কলি শুনে আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম। অনুষ্ঠা-নের শুরুতে কি বলা হল, আর এখন পরিবেশন করছে কি! শিশুটি কি

www.pathagar.com

জানে 'আই এম এ ডিস্‌কো ড্যান্সার'— বোম্বের কোন্ ছবির গান? এ গান কে গেয়েছিল এবং কেন গেয়েছিল। এ গানের পরিবেশটি কেমন ছিল। আর গানটির অর্থই বা কি? শিশুটির দোষ দিয়ে আর কি লাভ। এ গানটির এখানে পরিবেশন-যোগ্যতা আছে কি না, সে বিষয়ে তো বড়রাই কোন চিন্তা-ভাবনা করলেন না। একেই বোধ হয় বলে গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দেয়া।

পাশ্চাত্যের অপসংস্কৃতির বিকৃতি ও গড্ডলিকা প্রবাহে শুধু আমরাই নই, এই দক্ষিণ এশিয়ার সব ক'টি দেশই যেন গা ভাসিয়ে দিয়েছে। তাই আজ বোম্বে-সংস্কৃতি, কোলকাতা-সংস্কৃতি, আর ঢাকাই সংস্কৃতির মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যায় না। পার্থক্য যা আছে তা শুধু মাত্রার পার্থক্য।

কোলকাতার সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তার একটি উপন্যাসে আমাদের হালফ্যাসানের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের একটি চিত্র সুন্দরভাবে তুলে-ধরেছেন। উপন্যাসের নায়ক বাদল হলরুমে বসে আছেন। তার সামনের রো-তে দু'জন ফিসফিস করে আলোচনা করছেঃ "গৌতম রায়ের পাশের মেয়েটাকে দেখছিস, মাইরি, আগুন একদম। অপরজন সবজান্তার ভঙ্গিতে বললো, আজকাল নতুন গাইছে, ফাটিয়ে দিচ্ছে মাইরি, শিগগিরই টপে উঠে যাবে দেখিস------তুই তা হলে খুব কাছে থেকে দেখেছিস বল?— কাছে থেকে মানে কি! বট্‌লটা দেবার সময় ওর সঙ্গে আমার হাতে হাত ছুঁয়ে গেল, ঠিক যেন কারেন্ট মারলো মাইরি, একেবারে ফোর ফরটি ভোল্ট —গৌতম রায় জোটায়ও খুব ভালো জিনিস। গতবছর পুজোর সময় তেই-শের পল্লীর ফাংশনে দেখলাম অন্য দুটো মেয়ে, সে দু'জনও দারুণ ছিল, তারাও শালী ছিল নাকিরে?

—কিন্তু এর মতন আর কেউনা। চোখ ঘোরাচ্ছে দ্যাখি, না একে-বারে চাকু মারছে, একেবারে তাজা মাল।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাদলকে শুনতেই হল ওদের কথা। মানুষ ইচ্ছে মতন তো আর কান দুটো বন্ধ করতে পারে না। বাদল জোর করে মনোযোগও ফেরাতে পারছিলনা অন্যদিকে।

কিন্তু এইতো সবে শুরু, বল্লবী সিনেমায় নামাতে চাইছে। এরপর

www.pathagar.com

তার শরীরের প্রতিটি অঙ্গ নিয়ে রাস্তায় যে কোন লোক রসালো আলোচনায় মেতে উঠবে এবং লোক যত বেশী তাকে নিয়েও রকম আলোচনা করবে, ততই তার সার্থকতা আসবে। ফিলিম লাইনে এর নামইতো জনপ্রিয়তা।

—বেশীক্ষণ রাগ চেপে রাখলে বাদলের হাত কাঁপে। বাদলের চোয়াল শক্ত হয়ে এসেছে। হাত কাঁপছে অল্প অল্প, কিন্তু তার কিছুই করার নেই। বাদল সেখানে থেকে ঝট্ করে উঠে বাইরে বেরিয়ে এলো।"

বাদল সংস্কৃতির বিকৃত পরিবেশ থেকে বেরিয়ে এসে হয়তো নিজকে আপাতঃ জ্বালা থেকে রক্ষা করলো। কিন্তু সে বিকৃত সংস্কৃতি কি কক্ষের ভিতর সবাইকে উন্মত্ত করে তুলছিল না। সে কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসলেও এ সমাজ থেকে তো আর বাদল বেরিয়ে যেতে পারছে না। তাই আমাদের মনে প্রশ্নঃ বাদলের মুক্তির পথ কোনটা?

পাশ্চাত্যের অনুকরণে সে একই ভোগবাদী লিপ্সা আমাদের সাংস্কৃতিক অঙ্গনকে গ্রাস করে ফেলছে। সংস্কৃতি প্রকাশের বাহন পত্র-পত্রিকা, রেডিও, টিভি আর সিনেমায় তো চলছে তারই লীলা খেলা। আর তা দেখে আমাদের দেশের তরুণ তরুণীরাও হয়ে উঠছে চঞ্চল। তাদের এই চঞ্চলতা প্রকাশ পায় পার্কে, মাঠে-ময়দানে। কবির বাণীরূপে সে দৃশ্যগুলো হলঃ রমা-রমনীরা রমনায় রমে রম্ভা সম। অথবা লালবাগে লাল ললনার লীলা ললিত লোল---------ইত্যাদি।

আর আধুনিক ব্যবসায়ীরাও এ চেতনা থেকে পিছিয়ে নেই। প্রসাধনী বিজ্ঞাপনে তারা তাদের ব্যবসায়িক স্বার্থবুদ্ধির চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। টিভির প্রসাধনী -বিজ্ঞাপন দেখেছেন এমন যে কেউ বিষয়টি ভাল করেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারেবেন।

ব্যবসায়ীরা আজকাল আর শুধু টিভি, সিনেমাতে নারীদেহের আশ্রয়ে পণ্যের বিজ্ঞাপন প্রচার করে সন্তুষ্ট নন। তারা নারীদের রূপালী পর্দার অন্তরাল থেকে সরিয়ে এনে সরাসরি দর্শকদের সামনে উপস্থাপিত করতে চান। আর তাইতো আয়োজন হয় ফ্যাশন শো'র। সম্প্রতি এমনই একটি ফ্যাশন শো'র আয়োজন করা হয়েছিল ঢাকার একটি অভিজাত হোটেলে। সেখানে নারীরা একটি সংস্থার শাড়ী পরে বিভিন্ন অঙ্গ-ভঙ্গিতে মোহিত করতে চেষ্টা করেছেন দর্শকদের। নারী দেহের এই যে ডেমোনেস্ট্রেশন, সেটা কিসের আলামত? জীবন যাপন করতে গিয়ে তো আমাদের নানা পণ্যের

www.pathagar.com

প্রয়োজন। সেজন্য পণ্যের ডেমোনেস্ট্রেশন চলতে পারে বৈ কি। কিন্তু সাথে নারী দেহের ডেমোনেস্ট্রেশন? নারীরা কি তাহলে একটি পণ্য? তারাও কি বিক্রয়যোগ্য? জানিনা আধুনিকতার নামে আমাদের আরো কত বিকৃতি দেখতে হবে।

কিন্তু আমাদের চোখ কি কখনোই খুলবে না! আমরা যে পাশ্চাত্যের অনুকরণ করছি, তাদের অবস্থাটা এখন কেমন? তারা তো তাদের ভোগ বাদী জীবন দর্শন চর্চা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তাই তো আজকাল ভারতের কাশীর রাস্তায় প্রায়ই দেখা যায় ঝাঁকে ঝাঁকে মেম আর সাহেবকে। তাদের পরণে নোংরা ছেঁড়া পোশাক। তাদের মাথায় চিরুনি পড়ে না অনেক দিন। গঙ্গার ঘাটে ওরা গোল হয়েবসে ছিলমে গাঁজা খায়। কিসের অভাবে তারা দেশ ছেড়ে ছুটে এসেছে এত দূরে আর কেনইবা থাকছে এমনভাবে? নিজ সমাজ ব্যবস্থায় হতাশ এই সমস্ত যুবকদের আমরা বিটনিক আর হিপ্পি বলেই জানি।

পাশ্চাত্যের একশ' বছরের বাসী জিনিস রপ্ত করেই তো আমরা আধুনিক হয়ে উঠি। তাই ইদানিংকালের জঙ্গল-নাইট আর ফ্যাশন শোর বহর দেখে মনে হয়, আমাদেরও বুঝি হিপ্পি হওয়ার আর বেশী দিন বাকি নেই। কিন্তু আমাদের অবস্থাটা তখন কেমন হবে? ধনী দেশের ঐসব হিপ্পিরাতো দেশ বিদেশ ঘুরে শান্তি খোজার সামর্থ রাখে। কিন্তু আমাদের তা আছে কি? তাই আমাদের বোধ হয় সুন্দরবন ছাড়া আর কোথাও যাওয়ার উপায় থাকবে না। কিন্তু সেখানেও আমাদের আশ্রয় মিলবে কি? বনের পশু-প্রাণী কি আপন করে নেবে আমাদের?

রচনাকাল: ৩ মার্চ ১৯৮৫

www.pathagar.com

ফিল্ম-লাইন এবং আলু-পটলের ব্যবসা

দিন কয়েক আগের ঘটনা। কিশোর ছেলের হাত ধরে ঢাকার এক সচ্ছল আত্মীয়ের বাড়িতে উঠেছেন এক বৃদ্ধা। ঘটনাক্রমে আমিও তখন সে বাড়ির মেহমান। এই বৃষ্টি বাদলার দিনে হঠাৎ কিশোর ছেলেকে নিয়ে গ্রাম থেকে বৃদ্ধার আগমনে আমাদের অনেকের মনেই কিছুটা কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছিল। আর সে কারণেই কিছুক্ষণের মধ্যেই জানতে পারলাম বৃদ্ধার ঢাকা আসার কারণ। কিন্তু বৃদ্ধা চোখ দেখাতে ঢাকা এসেছেন, এই কারণ শুনে ঘরের কোন কোন সদস্যের কপাল কুঞ্চিত হয়ে উঠলো। একজনতো বলেই বসলোঃ এই তো কিছুদিন আগেই ডাঃ মোস্তাফিজুর রহমানকে দিয়ে ওনাকে দেখানো হয়েছিলো। উনি তো বলেই দিয়েছেন, এই চোখ নিয়ে ডাক্তারদের আর করার কিছু নেই। আরেকজন একটু দয়াপরবশ হয়ে বললেনঃ গ্রামের মানুষ তো ঠিক বুঝে উঠতে পারেন না, আরেকবার ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলে এমন কি আর দোষ। এমনতরো নানা কথায় দুপুরের খাবার সময় হয়ে এলো। যথারীতি খাওয়া-দাওয়া শেষ করে সোফায় গা এলিয়ে পত্রিকার উপর নজর বুলাচ্ছিলাম। এমনি সময় বৃদ্ধার সেই কিশোর সন্তান আমার পাশে এসে বসলো। চোখ তুলে জানতে চাইলাম, কিছু বলবে? সে কাঁচুমাচু করে বলতে শুরু করলোঃ 'আমি ফিল্মে কাজ করমু, চলচ্চিত্র বিভাগে 'লাইট-বয়' পোস্টে দরখাস্ত করছি। এইট পাস চাইছে, আমি তো নাইনে পড়ি। আমারে আপনার ছুকাইয়্যা দেওন লাগবো।' আমি তো ওর কথা শুনে অবাক। বললামঃ তুমি তো এখনো মেট্রিকই পাস করনি। এই লেখা-পড়া নিয়ে চাকরিতে গেলে জীবনে কখনো সুখ পাবে না। তাছাড়া ঐ বিভাগে আমার পরিচিত তেমন কোন লোকজনও নেই। এসব বাজে চিন্তা বাদ দিয়ে লেখাপড়ায় মন দাও। আমার এ কথাশুনে কিশোরটি যেন মরিয়া হয়ে উঠলো। সে বললোঃ 'না, যত খারাপই হোক আমি 'লাইট বয়' পোস্টেই ছুকুম। এই পোস্টে ২।৩ বছর কাজ করলে আমি নায়ক পোস্টে প্রমোশন পামু। আর নায়ক অইলে তো লাখ লাখ টাকা।'

www.pathagar.com

ওরা কথা শুনে আমি ভড়কে গেলাম। পাগল হয়েছে নাকি? 'লাইট-বয়' থেকে তো প্রমোশন পেয়ে সারা জীবনেও নায়ক হওয়া যাবে না। নায়ক তো চাকরি করে হওয়া যায় না। ওটা আলাদা গুণ---আলাদা ব্যাপার। কিন্তু কিশোরটিকে আমি কোন ক্রমেই বোঝাতে পারলাম না। অগত্যা একটু রাগ হয়েই বললাম, এসব আকাশ কুসুম কল্পনা বাদ দিয়ে আগে মেট্রিকটা পাস কর। তখন না হয় একটা চাকরির ব্যবস্থা করা যাবে। কিন্তু তার সেই একই গোঁঃ 'এই চাকরি ছাড়া আমি আর অন্য কোন চারকি করুম না।' ইতিমধ্যে গ্রামের এই কিশোরের নায়ক হওয়ার সাধের কথা অনেকেরই জানা হয়ে গেল। শুরু হলো তখন নানা টিপ্পনী। কেউ বলে, কি বা ফিগার, কেউ বলে, কি বা চুল। এসব শুনে আমার উসখুস অবস্থা হলেও তাকে দেখি বেলাজ। ডাইনিং রুমের আয়নার সামনে গিয়ে সে দিব্যি নিজের ফিগার মাপতে লাগলো আর বেক-ব্রাস চুলে আঙ্গুল চালাতে চালাতে তাতে আরো ঢেউ খেলাতে লাগলো।

কিশোরের এই অবস্থা দেখে বাড়ির দু'একজন বয়স্ক সদস্য বৃদ্ধাকে বললেনঃ আপনার ছেলে কি বলছে শুনেছেন? ও নাকি নায়ক হবে। লেখা পড়ার চিন্তা বাদ দিয়ে ও এসব আবোল-তাবোল কি ভাবছে? এ সব প্রশ্নের জবাবে অন্ধ বৃদ্ধার মুখ থেকে যা বেরিয়ে আসলো তা শুনে তো সবাই অবাক। বৃদ্ধা বললেনঃ 'দেখনা বাপু ওরে একটু চাকরিটা দিতে পার কিনা। অয় নায়ক হইতে পারলে তো অনেক লাভ। লাখ-লাখ টাকা, তখনআর আমাগো কোন দুঃখ থাকবো না।'

বৃদ্ধার কথা শুনে এবার ব্যাপার পরিষ্কার হলো। চোখ-টোখ নয়, এবার ঢাকায় আসার আসল উদ্দেশ্য হলো ছেলেকে নায়ক বানানো। কে যে ওদের এ বুদ্ধি দিল। ফিল্ম-লাইন মানেই কি টাকার লাইন? এসব ওরা ভাবে কি করে? মনে কেমন যেন একটু দুঃখবোধ জাগলো। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবলামঃ গ্রামের এসব অশিক্ষিত মানুষের কথায় দুঃখ পেয়ে লাভ কি? শহরের যারা শিক্ষিত লোক, যারা চলচ্চিত্র শিল্পের সাথে জড়িত আছেন, তাদের-ই বা ক'জন ফিল্ম লাইনকে অর্থ উপার্জনের লাইন ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারছেন? আলু-পটলের ব্যবসার মত তারাও তো এ শিল্পকে নিছক ব্যবসা ছাড়া আর কিছু ভাবছেন না।

কিন্তু চলচ্চিত্র তথা শিল্পসংস্কৃতির এই লাইনটি তো নিছক কোন ব্যব-

www.pathagar.com

সায়িক লাইন নয়। এর সাথে জড়িত থাকে সাংস্কৃতিক অঙ্গীকার। জড়িত থাকে জাতির আশা-আকাংখা, বোধবিশ্বাস, জীবন-যাপন সবকিছু। কিন্তু আমাদের চলচ্চিত্র, আমাদের ভিডিও, আমাদের টিভি দেখে তো তা বোঝার উপায় নেই।

শিল্প-সংস্কৃতির এই লাইনটি আমাদের দেশে যে অবয়বে বিরাজ করছে, সব দেশে কিন্তু তার অবয়ব সে রকম নয়। এ প্রসঙ্গে কিছুদিন আগে ভারতে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যায়। চলচ্চিত্র জগৎ সম্পর্কে যারা খোঁজ খবর রাখেন তারা সবাই জানেন যে, এখন ভারতের সবচেয়ে জনপ্রিয় টিভি সিরিয়াল হলো 'রামায়ণ'। কিন্তু জঙ্গী শিখরা হিন্দু মহাকাব্য রামায়ণ অবলম্বনে নির্মিত এই ধারাবাহিক সিরিয়ালটি সর্ব-সাধারণ্যে প্রদর্শিত হতে দিতে নারাজ। তারা মনে করছে, এই সিরিয়ালটি তাদের জাতীয় আশা আকাংখার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণায় শামিল এবং এই সিরিয়াল তাদের চলমান সংগ্রামের বিরুদ্ধে একটি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। তাই তারা রামায়ণ দেখার বিরুদ্ধে পাঞ্জাবীদের হুঁশিয়ার করে দিয়েছে। আর এই হুঁশিয়ারি না মেনে রামায়ণ দেখার অপরাধে সম্প্রতি জঙ্গী শিখরা এক দম্পতিসহ আরো পাঁচ ব্যক্তিকে হত্যা করেছে। এই দম্পতি তখন ঘরে বসে রামায়ণের ভিডিও দেখছিল। এর আগে হরিয়ানা রাজ্যের কুরুক্ষেত্র শহরে ভিড় করে ভারতীয় টেলিভিশন 'দুরদর্শনে' রামায়ণ দেখার সময় জঙ্গী শিখদের বোমাবর্ষণে পনের ব্যক্তি নিহত ও অপর তিনজন হয় আহত।

উপরোক্ত ঘটনার বিবরণ পড়ে কেউ বলতে পারেনঃ শিখদের এ বড় বাড়াবাড়ি। কেউ বলতে পারেনঃ ধর্মনিরপেক্ষ ভারতে আবার হিন্দু মহাকাব্য রামায়ণ নিয়ে রাষ্ট্রীয় টিভিতে ধারাবাহিক কেন? আবার জঙ্গী শিখদের প্রতি সহানুভূতিশীল কেউ বলতে পারেনঃ উক্ত ঘটনা শিখদের কোন বাড়াবাড়ি নয়, তা যুদ্ধরত শিখদের সামগ্রিক সংগ্রামের একটি অংশ মাত্র। আমি কিন্তু আপাতত ঐ সব মতামতের সমর্থন বা বিরোধিতা করে কিছুই বলতে চাই না। আমি শুধু ঐ ঘটনা থেকে শিক্ষা নিতে চাই। আর তা হলোঃ চলচ্চিত্র নিছক ব্যবসায়িক কোন পণ্য নয়, জাতির বাঁচা মরার প্রশ্নও থাকে সেখানে জড়িত। কিন্তু চলচ্চিত্র ও চলচ্চিত্র শিল্পের সাথে জড়িত আমাদের দেশের কর্তা ব্যক্তিরা বিষয়টিকে এ দৃষ্টিতে দেখবেন

www.pathagar.com

কখন? জাতির বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর বোধ-বিশ্বাস, আশা-আকাংখা ও জীবন-যাপনের অনুপস্থিতিতে আজ চলচ্চিত্র অঙ্গনে যে বিকৃতি ও অসুস্থতার ধস নেমেছে তা দেখারও কি কেউ নেই? আমাদের দেশে চলচ্চিত্র কি শুধুই অর্থ সমাগমের একটি রমরমা মাধ্যম হিসেবেই মুখ থুবড়ে পড়ে থাকবে? নাকি এ মাধ্যম অচলায়তনের দ্বারা ভেঙ্গে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হবে?

আমাদের দেশের চলচ্চিত্র শিল্পে অনাকাংখিত ব্যবসায়ের মোহভঙ্গ না ঘটলে 'অন্ধের যষ্টি' গ্রামীণ সেই কিশোরটিকে আর দোষ দিয়ে লাভ কি?

রচনাকাল: 8 জুলাই ১৯৮৮

www.pathagar.com

মনের মনিকোঠায় বৈচাশুঁটকি

নানা বিষয়ে তখন আমাদের মধ্যে আলাপ চলছিল। সাহিত্য-সংস্কৃতি, রাজনীতি, সমাজনীতি, খেলাধুলা কিছুই বাদ যাচ্ছিল না। জমজমাট সেই আসরে পর্দা ফাঁক করে ঝড়ের বেগে হঠাৎ করে ঢুকে পড়লেন একজন। এক হাতে তার ব্রীফকেস অপর হাতে একটি ঝোলা। ঢুকেই তিনি উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলেনঃ 'ফুফু আপনার লাইগ্যা বইচার হুটকি আনছি।' বাক্য শেষ হবার আগেই তিনি শুঁটকির ঝোলাটি ফুফুর হস্তগত করলেন। বৃদ্ধা ফুফুর ফোকলা মুখে তখন সে কি হাসি!

আমাদের অভ্যস্ত আলাপে হঠাৎ করে লোকটির উটকো আবির্ভাবে প্রথমে আমরা একটু বিরক্তই হলাম। অতঃপর তার শুঁটকি সংবাদে কারো কারো মুখে অবজ্ঞা মিশ্রিত হাসির রেখা ফোটার আগেই তা আবার মিলিয়ে গেল। আর সেই হাসি মিলিয়ে যাবার কারণ 'ফুফুই'। 'শুঁটকি সংবাদে' ফুফুর হাসিমাখা উজ্জ্বল মুখ এবং তা গ্রহণের আন্তরিকতা দেখে আসরের নাগরিক লোকজন যেন চুপসে গেল। অতঃপর পরিবেশকে সহজ করে তোলার জন্য কেউ কেউ বলে উঠলেন, দেখতো ঝোলাতে কি কি আছে। ঝোলাতে দেখা গেল শুঁটকি ছাড়াও রয়েছে শিমের বিচি ও মটর শুঁটির পুটলি।

গৃহকর্ত্রী ফুফু শুধু বৃদ্ধাই নন দারুণ ব্যক্তিত্বের অধিকারীও তিনি। তাই সদ্য আসা ব্যক্তিটির প্রতি তার মনোযোগ দেখে আমরাই বা তার প্রতি অমনোযোগী হই কিভাবে? অতপর তিনিই হলেন আমাদের আসরের মধ্যমণি।

এতক্ষণ যে ব্যক্তিটির প্রসঙ্গে কথা বললাম তিনি গ্রাম থেকে আসলেও কিন্তু গ্রামীণ লোক নন। পেশায় তিনি উকিল এবং রাজনীতির সাথেও সক্রিয়ভাবে জড়িত। তবুও এই নগরবাসী লোকটি বরাবরই গ্রামের সাথে একটা সাম্পর্ক বজায় রাখেন।

গ্রামের সাথে তার সম্পর্ক রক্ষার বিষয়টিরও যে একটা গুরুত্ব আছে আসরের অনেকেরই সেদিন সে উপলব্ধি ঘটলো। আর সামান্য বৈচার শুঁটকিও যে মানুষের মন জয় করতে পারে, সে সংবাদও আমরা সেদিন জানলাম।

www.pathagar.com

বাসায় ফেরার পরও সেদিন আমার বারবার লোকটির কথাই মনে পড়লো। এই লোকটিকে এর আগেই আমি অনেকবার দেখেছি কিন্তু সে দিন তিনি যেন আমাদের কাছে একটু অন্যভাবে দেখা দিলেন। কিন্তু এর কারণ কি?

অনেক ভেবে-চিন্তে বুঝলাম, তিনি উকিল কিংবা রাজনীতিবিদ-এর কোনটাই সে কারণ নয়। অভ্যস্ত কাজকর্মের সাথে সাথে তিনি যে মানুষের মনের খবরও রাখেন সেটাই হলো সে দিন তাকে অন্যরকম মনে হওয়ার আসল কারণ। তার ফুফুর বাসায় তো তার চাইতে আমরা বেশী আসি। কিন্তু নগরবাসী এই বৃদ্ধার মনের মণিকোঠায় যে বৈচা-শুঁটকির একটা বিশেষ স্থান রয়েছে, সে সংবাদ তো আমরা রাখিনি। কিন্তু উকিল ভদ্রলোক সেই খবর রাখেন ঠিকই। এবং যথাসময়ে তা তিনি হাজিরও করলেন ফুফুর সামনে।

দ্রব্যগুণ বিচারে হয়তো বৈচা-শুঁটকি তেমন মূল্যবান কিছু নয়, কিন্তু ভাল লাগার বিচারে তা নিশ্চয়ই এই শহুরে বৃদ্ধার কাছে মহার্ঘ কিছু। তাই বৃদ্ধার অকৃত্রিম ভালবাসা তো উকিল ভদ্রলোকেরই পাওয়ার কথা। আর তিনি পেয়েছেনও তা। এই ধরনের ভালবাসাই বোধ হয় আমাদের সমাজে এখন দুর্লভ ব্যাপার। এদিক থেকে ভদ্রলোককে ভাগ্যবানই বলতে হবে।

বৈচা-শুঁটকির সূত্র ধরে সেদিন আমার ভাবনা রাজ্যে তোলপাড় কাণ্ড ঘটে গেল। কত জায়গার কথা মনে পড়লো, কত জনার কথা স্মরণ হলো। যে গ্রাম থেকে ভদ্রলোক ফিরে এলেন, সেই গ্রামেই তো পড়ে আছেন কত আপনজন। কিন্তু আমি তাদের ক'জনার খবর রাখি? তাদের সব সমস্যার হয়তো আমি সমাধান করতে পারবো না, কিন্তু সামর্থের ভিত্তিতে বৈচা-শুঁটকির মত কিছু দিয়ে তো তাদের মন রাখতে পারি— সম্পর্কের দিগন্তকে সজীব রাখতে পারি। আসলে মানুষের সাথে ভালবাসার, সখ্যতার সম্পর্ক বজায় রাখতে বস্তু অনিবার্য কিছু নয়, অনিবার্য হলো সজীব হৃদয়। বিদেশ-বিভুঁইয়ে যে আপনজনরা আছেন, আমাদের সবার পক্ষে সশরীরে তাদের কাছে কাংখিত বস্তুসমেত হাজির হওয়া হয়তো সম্ভব নয়। কিন্তু চিঠির মাধ্যমে তো তাদের মনের সুখ-দুঃখের শরীক হতে পারি। তাদের আত্ম-বিমোক্ষণের অংশীদার হতে পারি। কিন্তু আমরা হই ক'জনা? আপন

www.pathagar.com

জনের পত্র বঞ্চিত হয়ে বিদেশ-বিভূঁইয়ে কতজনার কত সময় যে অশ্রুজলে ভারী হয়, সে খবরই বা আমরা ক'জনা রাখি?

বিদেশ বিভূঁইয়ের কথা না হয় বাদই দিলাম। কিন্তু স্বদেশের স্বজনদের মনের খবরই বা আমরা কতটুকু রাখি? একই দেশের ভিন শহরে হয়তো বাস করছে কারো বোন। বোন তো ভাইয়ের পথ চেয়ে বসে আছে। গ্রীষ্ম যায়, বর্ষা যায়, শরৎ যায় কিন্তু ভাইয়ের আর দেখা মিলে না। ভিন শহর কেন, একই শহর কিংবা একই ছাদের নীচে যাদের বসবাস তারাই বা আপনজনদের খবরাখবর কতটুকু রাখি?

আমরা আপনজনদের খবরাখবর না রেখে পরিবার গড়তে যাই, সমাজ গড়তে যাই, গড়তে যাই রাষ্ট্রও। কিন্তু এতবড় ফাঁক নিয়ে কিছু গড়া যায়? আমাদের বর্তমান হাল-চাল দেখে মনে হয় আমারা যেন মন ছাড়াই মানুষ পেতে চাই। কিন্তু যেখানে মন থাকে না, সেখানে মানুষ থাকে কি?

মানুষ বলি, সমাজ বলি কিংবা রাষ্ট্র বলি—সবারই অন্তরের দিক বলে একটা জিনিস আছে। সেই অন্তরকে না বুঝলে আসলে কিছুই বোঝা হয় না। তাই আমরা যদি কোন মানবিক পরিবার, সমাজ কিংবা রাষ্ট্র গড়তে চাই তাহলে অবশ্যই আপনজনদের, আপন সমাজের, আপন রাষ্ট্রের হৃদয়কে জানতে হবে বুঝতে হবে। আপনজনদের হৃদয় কি, তা তো আমাদের জানা। আশা করি, সমাজ ও রাষ্ট্রের হৃদয়ের সংবাদও আমাদের অজানা নয়। কিন্তু জানা পথে আমাদের যাত্রা হয় না কেন? আমাদের অভি-যাত্রা তো এখন লক্ষ্যহারা বিচিত্রগামী। এই বিচিত্রগামিতা আমাদের চলার ক্লান্তি উপহার দিচ্ছে ঠিকই কিন্তু দিতে পারছে না কাংখিত সুখ ও শান্তি।

সে দিনের বারোয়ারী আসর থেকে আমার মনে এই উপলব্ধি এসেছে: এই গ্রহে কাংখিত পরিবার, সমাজ কিংবা রাষ্ট্র পেতে হলে আমাদের অবশ্যই সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের হৃৎ-কম্পনকে বুঝতে হবে। সে হৃৎ-কম্পন কখনো খবর দেবে বৈচা-শুঁটকির, কখনো বিশ্বাসের, কখনো ইতিহাসের, কখনো বা শোণিতের। হৃৎ-কম্পনের এই স্পন্দনকে বুঝতে পারলেই বোধ হয় আমাদের পথচলা হবে সুগম ও অর্থবহ। আর সজীব হৃদয়ের প্রতিটি মানুষই তো চায় অর্থবহ জীবন যাপন। তাহলে এপথে চলতে আমাদের বাধা কোথায়?

রচনাকাল: ১৭ মার্চ ১৯৮৮

www.pathagar.com

শপিং সেন্টার ঃ ফিল্ডিং, অডিশন এবং বেচা-কেনা

সমাজ-মনস্ক ব্যক্তিরা শুধুই ভেবে মরছেন। মানুষের আচার-আচরণ, সমাজের গতি-প্রকৃতি ইত্যাদি বিষয়ে আদাজল খেয়ে এত গবেষণার আদৌ কি কোন প্রয়োজন আছে? ড্রইং রুমে বসে ভেবে ভেবে অস্থির না হয়ে সোজা চলে আসুন না নগরীর প্রধান প্রধান বিপনী কেন্দ্রগুলোতে। এখানে আসলেই দেখবেন আপনার সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। হয়তো ভাবতে পারেন ঃ 'মেট্রোপলিটান সিটির প্রধান প্রধান বিপণী গুলোতে তো শুধু বড় লোকদেরই আনা-গোনা, সেখানে সাধারণ মানুষদের খুঁজে পাব কোথায়?' এখানেই তো আপনাদের নিয়ে সমস্যা। ড্রইং রুমে বসে বসে আকাশ পাতাল অনেক কিছু ভাবতে পারলেও কিন্তু বাস্তবতা সম্পর্কে আপনাদের জেনারেল নলেজ একদম পুওর। আরে মশাই বর্ণাল বিপণী বিতানে কে যে সাধারণ আর কে যে অসাধারণ সরেজমিনে তার হিসেবনিয়েছেন কখনো? আর যদি আপনার গ্রন্থের ভাষায় সাধারণ মানুষের দেখা পেতে চান, তবে তারও সুযোগ আছে বৈকি। দেখবেন, ঝলসানো বিপণী কেন্দ্রগুলোর কোণ ঘেঁষেই দাঁড়িয়ে আছে অনেক ফুটপাত-মার্কেট। সেখানে আপনি রহিমুদ্দীনদের সাক্ষাৎ যেমন পেয়ে যাবেন, তেমনি পাবেন মিয়াত আলী মাস্টারদেরও। এই শহরে 'ফাইভ স্টার' হোটেলের পাশাপাশি যেমনি আছে 'ইটালিয়ান হোটেল', এসব মার্কেটের অবস্থানও অনেকটা তেমনি আর কি। সাধারণভাবে আমরা মনে করি, হাজারো ঝামেলার মধ্যে শুধু প্রয়োজনীয় জিনিসটা কেনার জন্যই বোধহয় লোকজন শপিং সেন্টারগুলোতে এসে থাকে। কিন্তু আসলে কি তাই?

আপনি যদি কখনো একটু সময় নিয়ে আমাদের বাজার পরিব্রাজকদের একটু লক্ষ্য করেন, তাহলে নতুন অনেক কিছুই হয়তো দেখতে পাবেন। এদের মধ্যে কেউ কেউ অবশ্যই এমন আছেন যারা প্রয়োজনীয় জিনিসটা কিনেই কেটে পড়তে পারলেবেঁচে যান। বাজারের উটকো ঝামেলা তাদের কাছে অসহ্য। অবশ্য এ রকম ছিমছাম মানুষের সংখ্যা আমাদের সমাজের মত এ বাজারেও বেশ কম। আগেই বলেছিলাম, এ বাজারে কে যে সাধারণ

www.pathagar.com

আর কে যে অসাধারণ তা বোঝা মুশকিল। কিছু উদহরণ দিলে ব্যাপারটা কিছুটা খোলাসা হতে পারে।

হয়তো আপনি ভাইয়ের বিয়ের জন্য একান্ত জরুরী দু'এক ভরি সোনার গহনা কিনতে ঢুকেছেন দোকানে। পাশের কেউ হয়তো তখন স্বর্ণকারকে বলছে, 'দশ ভরি গহনা নিলাম একটু কনসেশান করবেন না'? ভরির অঙ্ক শুনে ভালো করে লক্ষ্য করতেই দেখবেন, আপনি কেন যেন একটু চমকে উঠেছেন। আরে এযে আমার পরিচিত অমুক জন! কিন্তু ভরির অঙ্ক শুনে হয়তো তাকে আপনার কিছুটা অপরিচিতই মনে হবে। যদিও তার চাকুরীর সাধারণ পদবিটা আপনার কাছে বেশ সুপরিচিত।

হয়তো কোন দোকানে ঢুকেছেন কাপড় কিনতে। হরেক রকম কাপড়ের মাঝখান থেকে হয়তো কেউ মুখ বিকৃত করে বলে উঠলোঃ নাহ্, কি যে কাপড় রাখেন—একটাও পছন্দ হলো না। আপনি তখন লক্ষ্য করলে ঠিকই দেখবেন, ঐ ব্যক্তির দন্তবিকাশের চাইতে কাপড়গুলোর চেহারা অনেক সুন্দর। আরো একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখবেন, তিনি শব্দের বাণে যে আভিজাত্য প্রকাশ করতে চেয়েছেন, তা তার সামগ্রিক সত্তার সাথে ঠিক সামঞ্জস্যশীল নয়। অর্থাৎ এদের হাতে এমন কিছু কালো টাকা এসে জমা হয়েছে, যা তারা হজম করতে পারছে না।

এতো গেলো একদিক। বাজারে আর এক ধরনের ক্রেতা গোষ্ঠী আসেন, যাদের মূল কাজই হল নিজকে প্রদর্শন করে বেড়ানো। তারা এমন ভাবে সেজে গুজে আসেন যে, মনে হয়—তারা যেন কিছুইকিনতে আসেননি বরং তাদের ধারণকৃত বস্তু নিচয় থেকে বোধহয় কিছু বিক্রিই করে যাবেন। এদের উদ্দেশ্যেই কবির ভাষায় বলতে ইচ্ছে করেঃ 'যেমনি আছ তেমনি এস আর করো না সাজ।' যাক, এরা শুধু সেজেগুজে এলে তো বেঁচেই যেতাম। কিন্তু সুসজ্জিত দেহ বল্লরী নিয়ে তারা যে কর্মকাণ্ড করে যান, তা একদিকে যেমন হাস্যকর তেমনি অপরদিকে লজ্জাকরও বটে।

যিনি মনে করেন তার দাঁত গুলো বেশ সুন্দর, তিনি তো পণ্য ক্রয়ের সময় প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে দন্ত-বিকাশের সুযোগ হাতছাড়া করবেন না। আবার যিনি মনে করেন তার ধ্বনি বেশ মাধুর্যমণ্ডিত তিনি তো শ, ষ ও স-এই অক্ষর তিনটির ব্রহ্য স্পর্শে দোকানে এক 'হিসিস' তরঙ্গের বান তুলে ছাড়বেন। শুধু কি তাই! এরা রীতিমত অনুপ্রাসের শব্দমালা তৈরী করে

www.pathagar.com

নিয়ে আসেন দোকানদারদের সাথে কথা বলার জন্য। 'আনা দরে আনা যায় কত আনারস' এর মত এরা অনুপ্রাস করে বলেন: 'কালো কামিজ টার কাটতি কেমন' বা 'লাল শালটার কপাল ভাল' ইত্যাদি। সব দেখে শুনে মনে হয়, এসব ললনারা যেন দোকানে কেনা-কাটা করতে আসেননি, এসেছেন টিভি বা রেডিওতে অডিশন দিতে। প্রদর্শনেচ্ছা আর কাকে বলে! রমরমা বাজারগুলোতে আরেক ধরনের ক্রেতা গোষ্ঠীর আবির্ভাব লক্ষ্য করা যায়। এরা নিজেদেরকে 'ফিল্ডার' ভাবে। শপিং সেন্টারগুলোতে ফিল্ডিং দেওয়াই নাকি তাদের প্রধান কাজ। আমরা জানি, সাধারণতঃ ক্রিকেটেই 'ফিল্ডিং' শব্দটি বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সেখানে ফিল্ডিং-এর প্রধান লক্ষ্য থাকে ক্যাচ ধরা। কিন্তু এই বাজারে যারা ফিল্ডিং-প্লেয়ার, তারা ধরেন কি? ললনাদের সেই উটকো প্রদর্শনীর মোহন বাঁশীই কি তাদের ডেকে আনে এই বাজারে?এবার বলুন তো নানা অঘটনের ব্যাপারে দোষটা কার? মাঠে ব্যাটিং আর ফিল্ডিং চললে দর্শক তো জুটবেই। আর অতি উৎসাহী দর্শকদের কেউ যদি কোন নিয়ম ভঙ্গ করে ফেলেন তবে তাকে খুব দোষ দেয়া যাবে কি? জানি না, এসব নর-নারীরা শপিং সেন্টারে আর কতদিন ক্রিকেট খেলে যাবেন!

এখন তো রমযান মাস। এ মাসে দিনে আমরা কোন রকম খাদ্য গ্রহণ করি না। কিন্তু শুধু এটুকুতেই কি রোযার কার্যকারিতা সীমাবদ্ধ থাকবে। এ মাসে তো আমাদের চক্ষুকে শাসনে রাখার কথা। কর্ণকে অশুদ্ধ শ্রবণ থেকে এবং জিহ্বাকে অরুচিকর উচ্চারণ থেকে বিরত রাখার কথা। কারণ যার কথায় বিশ্বাসী হয়ে আমরা মুসলিম হয়েছি, সেই মহানবী (সঃ) তো বলে গেছেন,"যখন তুমি রোযা রাখবে, তখন যেন তোমার শ্রবণ, তোমার নয়ন, তোমার রসনা এবং দেহের প্রতিটি অঙ্গ রোযা রাখে।"

কিন্তু এই পবিত্র রমযানে আমাদের শ্রবণ, আমাদের নয়ন, আমাদের প্রতিটি অঙ্গ কি রোযা রাখছে? এই রোযাতে আমাদের আলোচ্য সেই শপিং সেন্টারগুলোর দিকে একবার লক্ষ্য করে দেখুন না, সেখানকার চিত্রটা কেমন দাঁড়ায়। রোযা এলো বলে কি সেখানে কোন সংযমের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায়? মানুষ যেন ঢলের মত নেমে এসেছে বাজারগুলোতে। সেখানে আব্রু-ইজ্জতের কোন বালাই নেই। নয়নের রোযা তো দূরের কথা, তা যেন আরো বেশী তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়েছে। ভাবটা যেন সুদী ব্যবসায়ীর মত অনেকটা এ রকম: উদরে যা খালি রেখেছি চক্ষু দিয়ে তা সুদে আসলে

www.pathagar.com

উসুল করে নেব। শপিং সেন্টারের এমনি এক সুদী ক্রেতার বেহাল অবস্থা দেখে সে দিনতো এক মহিলা ক্ষেপে গিয়ে বলে উঠলেন, 'দেখে পথ চলুন নইলে তো হোঁচট খেয়ে পড়ে যাবেন।' মহিলার এ বেরসিক মন্তব্যে ভদ্রলোক বেশ ভড়কে গেলেন। কাচুমাচু করে সেখান থেকে কোন রকমে কেটে পড়লেন। জানি না, ভদ্রমহিলার মত সামাজিকভাবে কখন এসব অন্যায় অসুচির বিরুদ্ধে আমরা প্রতিবাদ মুখর হতে পারব।

আমাদের মার্কেটিং-এর বহর দেখে তো মনে হয়, এ কর্মটাই বোধ হয় রোযার প্রধান কাজ। নইলে কি রোযাদাররা জুমার নামায ফেলেও মার্কেটিং-এ ব্যস্ত থাকতে পারে। সেদিন জুমার নামায পড়ে বাসায় এসে শুনলাম, আমার এক আপনজন এসেছিলেন গিন্নীকে নিয়ে। এত তাড়াতাড়ি চলে যাওয়ার কারণ জানতে চাইলে মা বললেনঃ মার্কেটিং-এ এসে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়ায় বাসায় একটু বিশ্রাম নিতে এসেছিল ওরা, আবার বেরিয়ে পড়েছে মার্কেটিং-এ। ভেবে খুব দুঃখ হলোঃ হায়রে মুসলমান, পবিত্র রোযায় জুমার নামাযে যখন তোমার মসজিদে থাকার কথা, তখন তুমি পথভ্রষ্ট মুসাফিরের মত দোকানের দ্বারে দ্বারে ঘুরে ফিরছ পণ্যের পেছনে।

রোযায় যেখানে লালসাকে নিয়ন্ত্রণ করে আত্মা বা খুদীকে ষড়রিপু তথা নফসের উপর বিজয়ী করার কথা, সেখানে আমরা যেন পরাজয়ের পতাকা বহন করে চলেছি নির্বিকারভাবে।

এতো গেল রোযাদারদের কথা। আর যারা রোযা রাখেনি তাদের অবস্থা? তারা তাদের কাজ ঠিকই করে চলেছেন। তথাকথিত রোযাদারদের সম্মান করার মত ভুল তারা করেনি। পরিবার পরিজনদের জন্য এই কাঠফাটা রোদে মার্কেটিং করতে করতে ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে তারা ঢুকে পড়েছেন অভিজাত কনফেকশনারী শপগুলোতে। সেখানে গোগ্রাসে গিলছেন স্ন্যাক্স, টপসি (ফলের রস) আর চকোলেট মিল্ক। আর ফুটপাতে ফেলে দেয়া তাদের উচ্ছিষ্ট প্যাকেটগুলো দারুণ তৎপরতার সাথে হস্তগত করে নিচ্ছে ফুটপাতের ছিন্নমূলরা।

এসব 'শিপিং-স্টারদের' কর্মকাণ্ড দেখে মনে প্রশ্ন জাগেঃ এরা কি যাকাতের ফরয পালন করছেন? প্রকাশ্যে ফরয রোযা ভাঙ্গার ফ্যাশন দেখেতো মনে হয় না এরা যাকাতের ফরয পালন করছেন। কারণ তা

www.pathagar.com

পালন করলে তো ছিন্নমূলদের ফুটপাতে থেকে উচ্ছিষ্ট খাবার কথা নয়।

জুমাতুল বিদাতে ইমাম সাহেব বললেনঃ আমরা যাকাতের অর্থ ২।১ টাকা করে দিয়ে লোকদের অভ্যাস খারাপ করে ফেলছি—অর্থাৎ আমরা তাদের ভিক্ষুক থাকতেই সাহায্য করছি। তা না করে আমরা যদি আমাদের যাকাতের অর্থকে একত্রিত করে দরিদ্র নিকট আত্মীয় বা প্রতিবেশীকে দেই—তাহলে তারা যথার্থ অর্থে উপকৃত হতে পারে। হয়তো আগামীতে তারাই যাকাত গ্রহীতা না হয়ে যাকাত প্রদাতা হতে পারে। এভাবেই আমরা সমাজ থেকে দারিদ্র্যকে দূর করতে পারি। কারণ, এখনকার ভিক্ষুকরা তো কারো না কারো প্রতিবেশী বা আত্মীয়।

ইমাম সাহেবের বক্তব্য শুনে মনে হলোঃ সব ইমামরা যদি সমকালীন সমাজের প্রেক্ষাপটে ইসলামের শিক্ষাগুলো বাংলাতেও প্রচার করতেন, তাহলে মানুষের কত উপকারই না হতো।

জানি না, ইমাম সাহেবের বক্তব্য ক'জনের ঘরে গিয়ে পৌঁছবে। সেই 'শপিং স্টারদের' কানে আদৌ পৌঁছবে কিনা তাও আমার অজানা।

রচনাকালঃ ১৬ জুন ১৯৮৫

www.pathagar.com

তোফাজ্জল মিয়ার কপালে শেখসাদীর ভোগান্তি

বাসাটিতে গিয়ে বুঝলাম যা শুনেছি তা মিথ্যে নয়। আসলেই বাসাটির পরিবেশ এখন পাল্টে গেছে। গৃহকর্তা, যিনি এক সময় আমাকে ঠাট্টা করে বলেছিলেন: 'সবে তো বিয়ে হলো, দেখবো তোমার নামাযের পানচুয়ে লিটি কোথায় যায়। একেক মাস যাবে আর একেক ওয়াক্ত ঝরে পড়বে, কত দেখেছি----।' আর এখন তিনিই কিনা কাক-ডাকা ভোরে মসজিদে গিয়ে হাজির হন জামাত ধরার জন্য। শুধু তাই নয় বৃষ্টির মধ্যেও ছাতা হাতে করে জামাত ধরার জন্য আমাকে তাগাদা দিয়ে বসলেন। আমি মৃদু হেসে শুধু তাকে অনুসরণ করলাম। শুধু গৃহকর্তাই নন, তার তরুণ সন্তানদের মধ্যেও একই আবহ লক্ষ্য করলাম।

সমাজ সচেতন ব্যক্তিরা তো একথা জানেন যে, অনেক সময় সাংগঠনিক প্রয়াসের কারণে কোন কোন বাসার পরিবেশ এমনি করে পাল্টে যেতে পারে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে লক্ষ্য করলাম ভিন্ন কারণ। আর সে কারণ একজন মহিলা অর্থাৎ গৃহকর্ত্রীর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাতেই আজ বাসার পরিবেশ পাল্টে গেছে। আর গৃহকর্ত্রীর এই উদ্যোগের পেছনে সক্রিয় রয়েছে কিছু ধর্মীয় বই। নিজে নিজেই তিনি এই বইগুলো সংগ্রহ করেছেন। কিন্তু এখন সেই বই গুলো শুধু নিজেই পড়েন না অপরকেও পড়ান। আর তার বদৌলতে শুধু নিজ বাসাতেই নয়, প্রতিবেশীদের মনেও লেগেছে কাঁপন।

আমরা গেছি বেড়াতে কিন্তু দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর গৃহকর্ত্রী আমাদেরও ছাড়লেন না। গিন্নীর হাতে একটি বই দিয়ে বললেন: তুমি পড়, ওকেও শোনাও। বইটিতে ছিল দোযখের বর্ণনা। বর্ণনা শুনতে শুনতে কেমন যেন আনমনা হয়ে পড়লাম। দোযখের সেই ভয়াবহ দৃশ্যের সামনে আমার সামনে উপবিষ্ট স্ত্রী, কন্যা, পৃথিবী এবং আমার আটপৌড়ে জীবন সবই কেমন যেন অর্থহীন হয়ে পড়লো। দোযখের প্রচণ্ডতার কাছে সব কিছুই ম্রিয়মান মনে হলো। নিজের ভাবনা আমাকে ভীষণভাবে পেয়ে বসলো। আমার মানসিক অবস্থা তখন এমন পর্যায়ে পৌঁছে ছিল যে, গিন্নীর শত অনুরোধ সত্ত্বেও আমার আর প্রবৃত্তি হলো না ধোপদুরস্ত পোশাক পরে

www.pathagar.com

বাসায় রওয়ানা হতে। বললাম কি হবে আর এত সাজগোজ করে। যা পরে শুয়ে-বসেছিলাম সেই পায়জামা-পাঞ্জাবীর মলিন বসনেই ঘরে ফিরলাম।

গিন্নী বললেন, তুমি কি শুরু করেছো। মলিন বসনেই কি মুক্তি পেয়ে যাবে? এত মন খারাপ করোনা, দোযখে যাওয়ার মত কাজ না করলেই হলো—ব্যাস। বললাম, তোমার যুক্তির কথা আমি বুঝি, তবু মনটা যে কেমন করে উঠলো।

দিন গড়াতে লাগলো, আমরাও আপন আপন কাজে জড়িয়ে পড়লাম। দোযখের কথা এখনো মনে হয়, কিন্তু সে দিনের মত নিমগ্ন হয়ে ভাবার তেমন অবকাশ জোটে না। তাই বোধ হয় দোযখের কথা মনে হলেও তাতে আর চলার পথে থমকে যাই না। আলতো করে মন বলে ওঠে: তেমন অন্যায় তো আর করছি না, মেহেরবান আল্লাহ হয়তো বেহেশত-ই দেবেন। আশাবাদী মন তাই প্রাত্যহিক জীবনে বেশ চঞ্চল।

প্রাত্যহিক জীবনের রুটিনে সে দিন পত্রিকার ফাইল ঘাঁটতে গিয়ে একটি শিরোনামের উপর চোখটা থমকে দাঁড়ালো। 'এই নগরী ইহার জবাব দিবে কি?'—শিরোনামটা দেখে মনে কৌতূহল জাগলো, কিসের জবাব? শিরোনামের নীচে লেখা রয়েছে: বড় নির্মম এই নগরী। তার চাইতেও বেশী নির্মম এই নগরীর পুলিশ প্রশাসনের কিছু কর্মকর্তা ও কর্মচারী। তাঁদের খেয়াল খুশীর খেসারত দিতে হয়েছে গ্রামের একজন সরল হৃদয় বৃদ্ধকে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে ভিক্ষুক ধরে ভবঘুরে কেন্দ্রে পাঠানোর নির্দেশ জারি করা হয়েছিল। এই নির্দেশ পেয়ে পুলিশ প্রশাসনের কোন কোন কর্মচারী মলিন জামাকাপড় পরিহিত লোকদের ভিক্ষুক মনে করে গাড়ীতে তুলে নিয়েছে। তাদের এমনি খেয়াল খুশি ও সন্দেহের শিকার হয়েছেন পিরোজপুরের ভাণ্ডারিয়া উপজেলার ধাওয়া গ্রামের ৬০ বছর বয়স্ক বৃদ্ধ তোফাজ্জল মিয়া।

দুই বছর ধরে যন্ত্রণা সইবার পর পেট বেদনার চিকিৎসার জন্য তিনি এসেছিলেন পিজি হাসপাতালে। পিজি হাসপাতাল থেকে বের হয়ে পুনরায় লঞ্চযোগে গ্রামে যাওয়ার উদ্দেশ্যে সদরঘাটের দিকে রওয়ানা দিয়েছিলেন বৃদ্ধ। এমন সময় পুলিশের গাড়ী তোফাজ্জল মিয়ার সামনে হাজির। পুলিশ মলিন কাপড় চোপড় দেখে ভিক্ষুক ভেবে তাকে গাড়ীতে তুলে নিল। তোফাজ্জল মিয়া থানার কর্তাদের বলেছিলেন তিনি গ্রাম থেকে চিকিৎসার জন্য

www.pathagar.com

এসেছেন। তিনি ভিক্ষুক নন। তাকে ছেড়ে দেয়া হোক, কিন্তু কেউ বৃদ্ধের কথা শোনেনি। বৃদ্ধকে ভিক্ষুক বানিয়ে পাঠিয়ে দেয়া হয় ভবঘুরে কেন্দ্রে। কেন্দ্রের কর্তারা তার নগদ ৬শ'১০ টাকা, লুঙ্গি, জামা-কাপড় ও বিছানা পত্র জমা রেখেছিল।

একমাস পরে তার ছেলে চিঠি পেয়ে ঢাকায় আসে। তদবির করে বৃদ্ধ পিতাকে ছাড়ানোর ব্যবস্থা করে। গত ১৯শে অক্টোবর ভবঘুরে নিয়ন্ত্রক ৫শ' টাকা বণ্ড রেখে ৩২৩ নম্বর আদেশপত্র বলে তাকে ছেড়ে দেন। ভবঘুরে কেন্দ্র হতে বের হওয়ার জন্য তোফাজ্জল মিয়ার খরচ হয়েছে মোট ৫শ' ২০ টাকা। আর ভবঘুরে কেন্দ্র হতে বের হবার সময় গচ্ছিত ৬শ ১০ টাকা, লুঙ্গি, বিছানাপত্র তাকে ফেরত দেওয়া হয়নি। তাই তোফাজ্জল মিয়ার প্রশ্নঃ তিনি ভিক্ষুক নন তবুও তাকে ভিক্ষুক বলে ধরে নেয়া হয়েছিল কেন? তার সর্বস্ব কেন রেখে দেয়া হল? ভবঘুরে কেন্দ্র থেকে বের হতে কেন ৫শ' ২০ টাকা কর্তাদের খরচপত্র দিতে হলো? এই নগরী তার জবাব দেবে কি?

এই নগরী বৃদ্ধ তোফাজ্জল মিয়ার প্রশ্নের জবাব দেবে কিনা জানিনা। তবে সাধক কবি শেখসাদী বোধ হয় বহু আগেই তার জবাব দিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু আমাদের দেশের প্রশাসনের শিক্ষিত কর্মচারীরা এত জলদি সে জবাবের কথা ভুলে গেলেন কেমন করে? প্রথম বারে সাধারণ বেশভূষার জন্য তো শেখসাদী দরবারে কদর পেলেন না। কিন্তু পরের বার? উজ্জ্বল ভূষণের জন্য পরের বার যখন শেখসাদী দেদার খাতির পেলেন তখন তিনি প্রশাসকদের আচ্ছা জবাবই দিয়েছিলেন। খাবার-দাবার নিজে না খেয়ে পোশাককে খাওয়াতে লাগলেন। মেজবানদের বিস্ফোরিত নেত্র লক্ষ্য করে বললেনঃ আপনারা আমার নয় পোশাকের কদর করেছেন, তাই এই খাবার-দাবার পোশাকেরই প্রাপ্য। লজ্জায় তাদের মাথা হেঁট হয়ে গেল।

আশা করবো শেখসাদীর ঘটনাটি মনে পড়লে বৃদ্ধ তোফাজ্জল মিয়ার কথা স্মরণ করে আমাদের প্রশাসন কর্মকর্তাদের মাথাও লজ্জায় হেঁট হবে। কিন্তু শুধু মাথা হেঁট করে রাখলেই তো চলবে না। মাথা তুলতে হবে এবং তোলার মতই তুলতে হবে। যাতে করে শুধু মলিন বসনের জন্য আর কোন তোফাজ্জল মিয়াকে যেন এমন হেনস্ত হতে না হয়।

তোফাজ্জল মিয়ার কথা ভাবতে ভাবতে আমার মনে পড়ছে সেই আত্মী-

www.pathagar.com

য়ার কথা, যিনি আমার মনে এনে দিয়েছিলেন দোযখের ভয়। এই জিনিসটি বোধ হয় খুব দরকার এখন আমাদের সমাজে। তোফাজ্জল মিয়াকে দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে বিভিন্ন ঘাটে। সে সব ঘাটের কর্তাদের মনে যদি দোযখের ভয়টুকু জাগরূক থাকতো, তাহলে বোধ হয় তোফাজ্জল মিয়াকে নিয়ে আমার আর লেখার প্রয়োজন হতো না।

রচনাকাল: ২৬ নভেম্বর ১৯৮৭

www.pathagar.com

ময়ূর পঙ্খী ভিড়িয়ে দিয়ে সেথা

সদরঘাট টার্মিনালে পৌঁছে দেখি দ্বিতল লঞ্চটি প্রস্তুত। 'বেঙ্গল ওয়াটার' নামের এই লঞ্চটিতে এই আমার প্রথম আরোহণ। প্রথম আরোহণ হলেও কিন্তু এই নৌ-যানটির সাথে এটিই আমার প্রথম দেখা নয়।

একেবারে শৈশবে স্কুলে যাবার আগে যখন মেঘনায় গোসল করতে যেতাম, তখন দেখতাম এই নৌ-যানটি ধোঁয়া উড়িয়ে ঢেউ তুলে ছুটে চলছে সামনের দিকে। সে সময় ছোট ছোট কাঠের লঞ্চগুলোর পাশাপাশি এই যানটিকে বেশ বনেদি মনে হতো। আমাদের চোখে তখন সে যেন রূপকথার এক ময়ূর পঙ্খী। এই ময়ূরপঙ্খীতে চড়া তখন আমাদের জন্য একটা আকাংখার বিষয় ছিল। ময়ূরপঙ্খীটির নাম এখন 'বেঙ্গল ওয়াটার'। আগে কিন্তু ওর এ নাম ছিল না। তখন নাম ছিল 'পাকওয়াটার'। ওর নাম থেকেই বোঝা যায় ও দু'টি কালের ইতিহাস ধারণ করে আছে। এদিক থেকে ওকে কিছুটা ঐতিহাসিক গুরুত্বের মহিমাও দিতে হয় বৈকি!

সে যাক। নৌযানটিতে উঠে আমরা ঠিকঠাকমত আসন নেয়ার পর যথাসময়ে সে যাত্রা শুরু করলো। জানালার পাশে আসন পাওয়ায় আমার নদী আর নদী তীরের নিঃসর্গ দেখার একটা বাড়তি সুযোগ মিলে গেল। সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে কার্পণ্য করলাম না মোটেও।

আমি মেঘনা পারের ছেলে। আমাদের ময়ূরপঙ্খীটিও তখন চলছিল মেঘনার তীর ঘেঁষে। মেঘনা তখন আর শুধু আমার চোখের সামনে নয়, আমার মনেও তখন মেঘনা। নস্টালজিয়া তখন আমাকে পেয়ে বসেছে দারুণ ভাবে।

ময়ূরপঙ্খীটি তখন যেন আর মেঘনার নয়, আমার বুক চিরেই সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখি আমার শৈশবের সেই নদী-ঘাট। সেই তীরের পাশ দিয়ে ছুটে চলছে ময়ূরপঙ্খী। আমার শৈশব তখন ময়ূরপঙ্খীকে যেন মিনতি করে বললোঃ একটু থেমে যাও। কিন্তু কে শোনে কার কথা। মহাকালের আহবানে ময়ূরপঙ্খী তখন ছুটে চলছে সামনের দিকে। কিন্তু সে যেন আর নদীর নয় আমার হৃদয় চিরেই সামনে এগুলো। সে

www.pathagar.com

সময় কর্ণ-কুহরে কে যেন বলে গেল---"যেতে নাহি দেব/তবু যেতে দিতে হয়। হায় তবু চলে যায়।"

ময়ূরপঙ্খী তো সামনে এগুলো কিন্তু আমার মন পড়ে রইলো পিছনে। পিছনে তাকিয়ে দেখি নদীর ঘাট বরাবর পুকুরের আইলে সেই তাল গাছটি এখনো ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। আর তার নীচেই কবরে শুয়ে আছেন দাদা--- আমার শুভ্র শ্মশ্রু মণ্ডিত দাদা। দাদার কথা ভোলা যায় না---ভোলা যায় না তার মায়ার কথা। দাদাকে তো আমরা যেতে দিতে চাইনি, তবুও দাদা চলে গেলেন। আসলে দাদাও থেকে যাননি আর ময়ূরপঙ্খীও থেমে যায়নি। কালের নিয়মে সবাই চলে যাবে সামনে; পেছনে পড়ে থাকবে শুধু তারকর্ম-- শুধু তার স্মৃতি। স্রষ্টার পৃথিবীর এ এক অমোঘ নিয়ম। নদীর মত আমার মনেরও যখন তোলপাড় অবস্থা তখন একটু আত্মস্থ হতে চেষ্টা করলাম। কারণ ময়ূরপঙ্খীতে আমার এ যাত্রা নিছক কোন প্রমোদ ভ্রমণ ছিল না, এ ভ্রমণের সাথে জড়িত ছিল দায়িত্বের প্রশ্নও।

আমরা যাচ্ছিলাম মেঘনা পারেরই একটি মফঃস্বল শহরে, শিশুদের একটি অনুষ্ঠানে। অনুষ্ঠানের বিষয়—আশয় নিয়ে ভাবতে ভাবতে ময়ূর পঙ্খী এক সময় ঘাটে এসে ভিড়লো। দোতলার রেলিং-এর পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম আমাদের নিতে কে আসবে---আমরা এখন কোথায় উঠবো? হঠাৎ নজরে পড়লো শিশু সংগঠনটির দু'জন কিশোরকে। ওরা সংগঠনের বিশেষ পোশাক পরে আসায় আমাদের চিনতে মোটেই অসুবিধে হয়নি। ওরা আমাদের অভিনন্দন জানিয়ে আপন করে নিল। পরিকল্পনা অনুযায়ী কিশোর দু'টি আমাদের নিয়ে গেল হোস্টেল সমৃদ্ধ একটি স্কুলে। ঐ স্কুলে শিশু সংগঠনটির কাজও বেশ ভাল। শিশু-কিশোর ও অভিভাবক-দের আতিথেয়তা, অনুষ্ঠান, ভাব বিনিময়, সব মিলিয়ে মফঃস্বল শহরটিতে দিন ভালই কাটছিলো। সর্বোপরি নিঃসর্গ সমৃদ্ধ নদী তীরবর্তী স্কুলটির সুশৃংখল পরিবেশ ছিল একটি বাড়তি পাওনা।

অনুষ্ঠান শেষে ব্যক্তিগত একটি প্রয়োজনে গেলাম শহরের সরকারী কলেজটিতে। কলেজে তখন চলছিল ডিগ্রী পরীক্ষা। অধ্যক্ষ আছেন জেনে সরাসরি তাঁর কক্ষে প্রবেশ করলাম। প্রবেশ করেই অনুভব করলাম অধ্যক্ষ মহোদয় আমার পূর্ব পরিচিত। কুশল বিনিময়ের পর তিনি আমাকে চা পানে আপ্যায়িত করলেন। চা খেতে খেতে আমি আমার প্রয়োজনীয়

www.pathagar.com

আলাপও সেরে নিচ্ছিলাম। কয়েকজন অধ্যাপক পরিবেষ্টিত এই শান্ত-শিষ্ট পরিবেশে হঠাৎ ঝড়ের মত প্রবেশ করলো তিন জন তরুণ। আলাপ শুনে মনে হলো তিনজনই কলেজের ছাত্র। ওরা তদবির করতে এসেছে একজন ছাত্রের বিষয় বদলির ব্যাপারে। অধ্যক্ষমহোদয় যথেষ্ট ধৈর্যের সাথে ওদের বোঝাতে চাইলেন যে, এখন এ কাজটি সম্ভব নয়। কিন্তু ছাত্ররা নাছোড়বান্দা। তাদের দাবী, যে করেই হোক কাজটি অধ্যক্ষকে করে দিতে হবে। তখন তিনি নিরুপায় হয়ে অফিস কক্ষ থেকে একটি ফাইল এনে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রেরিত সার্কুলারখানি দেখালেন। কিন্তু তাতে ও ছাত্ররা সন্তুষ্ট হল না। ওরা এক বিশেষ ভঙ্গি নিয়ে অধ্যক্ষের কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেল। ওদের ভাবসাব দেখে মনে হলোঃ ওরা সাধারণ ছাত্র নয়, নেতা গোছের ছাত্র। ছাত্রদের প্রস্থানের সাথে সাথে আমিও প্রস্থান করতে চাইলাম। কিন্তু এরি মধ্যে অধ্যক্ষ কথা শুরু করলেন। বললেনঃ দেখে যান, আমরা কেমন আছি। আবার চা এল। কিন্তু চা শেষ হতে না হতেই এবার ঝড়ের বেগে প্রবেশ করলো দু'জন ছাত্র। ওরা এতগুলো লোকের সামনে নির্দ্বিধায় একজন অধ্যাপকের নাম উচ্চারণ করে বললোঃ ওনাকে গার্ড হিসেবে কক্ষ থেকে বদলি না করলে আমরা পরীক্ষা দেব না। আবার ডায়লগ। ডায়লগে মনে হলো ছাত্র দু'জনই যেন শক্তিশালী আর অধ্যক্ষ মহোদয় অসহায়। ইতিমধ্যে গার্ডদানকারী সেই অধ্যাপক হল থেকে ফিরে এসে বললেনঃ যেখানে জীবনের নিরাপত্তা নেই সেখানে আমি গার্ড দিতে পারবো না। ইতিমধ্যে ক্ষমতাধর ছাত্র দু'জন চলে গেল পরীক্ষার হলে। আর অধ্যাপক মহোদয় আমাদের সাথেই বসে রইলেন। একটু পরেই সে দু'জন ছাত্রের শ্রেষ্ঠজন এসে অধ্যক্ষকে বললোঃ স্যার, ভাইস প্রিন্সিপ্যাল স্যার চ্যালেঞ্জ দিচ্ছে আমরা নাকি নকল করতে পারমু না। ঠিক আছে পরীক্ষা দিমু না। আপনারা পরীক্ষা নেন। ওর কথায় ছিল থ্রেটের গন্ধ। অধ্যক্ষ ঠিকই বুঝলেন। তিনি বললেনঃ যাবি কই? মাথা গরম করিস না—যা, বেসিনে গিয়া হাত মুখধুইয়া ঠাণ্ডা হয়। ছাত্রটি বেসিনের দিকে যেতেই অধ্যক্ষ বললেনঃ একটি ছাত্রের জন্য আমরা পরীক্ষা কেন্দ্রে হাঙ্গামা হতে দিতে পারি না। তিনি একজন প্রবীণ অধ্যাপককে দায়িত্ব দিলেন বিষয়টির একটা সুরাহা করার জন্য। একটি ছাত্রের কাছে শ্রদ্ধেয় শিক্ষকমণ্ডলীর অসহায় অবস্থা দেখে আমার খুব খারাপ লাগলো। আমি বিদায় নিয়ে চলে এলাম।

www.pathagar.com

স্কুলে এসে শক্তিধর ছাত্রটির নাম বলতে সবাই তাকে চিনলো। এক তরুণ বললঃ প্রশাসনও ওকে ঘাঁটাতে চায় না। কারণ ক্ষমতার রাজনীতিতে সে বেশ শক্তিধর।

স্কুল থেকে বিদায় নেবার সময় স্কুলের অধ্যক্ষকে বললামঃ কলেজ অধ্যক্ষ না হয়ে আপনি বেশ ভালই আছেন।

ফিরতি পথে আবার মেঘনার তীর ঘেঁষেই লঞ্চ ফিরছিলো। পুকুরের আইলে সেই তালগাছটি দেখে আবার মনে পড়লো সেই শৈশবের কথা, কৈশোরের কথা। কই তখন তো আমরা নকল বুঝতাম না, আর নকলের অধিকার নিয়ে শিক্ষকের সাথে ডায়লগ? এতো ছিল অসম্ভব কল্পনা! আর এখন?

তা হলে কি এত এগুবার পরও আমরা পিছিয়ে গেলাম? কিন্তু এই পিছিয়ে যাওয়ার কারণ কি? এগিয়ে চলার গান গাইতে যারা জাতিকে হরদম উপদেশ দেন, তারা বিষয়টি একটু ভেবে দেখবেন কি?

রচনাকালঃ ২২ অক্টোবর ১৯৮৭

www.pathagar.com

ভিলেনদের জন্য দায়ী কারা

আমরা তখন স্কুলের ছাত্র। দস্যু বাহরাম, দস্যু বনহুর আর কুয়াশা সিরিজের বইগুলো সে সময় আমরা গোগ্রাসে গিলতাম। ঐ বইগুলোর প্রতি ছিল আমাদের দুর্নিবার আকর্ষণ। তাই ক্লাস চলাকালীন সময়েও পাঠ্য বইয়ের নীচে থাকতো ডিটেকটিভ সিরিজের বই। ক্লাসের পাঠ থাকতো পাঠের জায়গায় আর আমরা ডুবে থাকতাম ভিন্ন জগতে। স্যাররা যে ব্যাপারটি ধরতে পারতেন না, তা নয়। ধরতেনএবং শাস্তিও দিতেন। কিন্তু সেই যে দুর্নিবার আকর্ষণ। তাই দেখা যেত ক্লাসের সবচেয়ে শান্তছেলেটিও প্রথমবারের পর দ্বিতীয় বারও একই কারণে শাস্তি মেনে নিচ্ছে। শুধু কি ক্লাসেই—বাসাতেও একই অবস্থা। পিতা-মাতার কঠোর শাসনে অনেক-কেই রাতের ঘুমে ট্যাক্স বসাতে হতো। সব চুপচাপ সুমসাম হয়ে গেলে তখন রাতের ঘুম হারাম করে আমরা চলে যেতাম ডিটেকটিভ জগতে। মাথায় তখন ঘুরে বেড়াত শুধু ডিটেকটিভ বইয়ের পোকারা।

শুধু পড়েই ক্ষান্ত ছিলাম না। সেগুলোর চর্চাও হতো আমাদের মধ্যে। চট্টগ্রাম সরকারী মুসলিম হাই স্কুলের ছাত্র হওয়ায় আমাদের বরাতে কিছু বাড়তি সুযোগও জুটল। স্কুলের পাশেই ছিল পরীর পাহাড়। ঐ পাহাড়ের উপরেই চট্টগ্রামের কোর্ট বিল্ডিংটি অবস্থিত। পাহাড়টি বেশ উঁচু। আর পাহাড়ের চারপাশে আছে ঝোপ-ঝাড়, গাছপালা। স্কুলের টিফিন—ছুটির সময় আমরা চলে যেতাম সেই পরীর পাহাড়ে। আর পাহাড়ের ঝোপ ঝাড়ে চলতো তখন ডিটেকটিভ ডিটেকটিভ খেলা। অনেক দিন খেলায় এতো মেতে থাকতাম যে স্কুলের কথা খেয়াল থাকতো না, টিফিনের ছুটি শেষ হয়ে যেতো। তখন অপরাধীর মত গিয়ে লাইনধরে দাঁড়াতাম ক্লাসের দরজায়। কখনো নীল ডাউন, কখনো নাকে খত, কখনো বেতের শাস্তির পর ঢোকার অনুমতি পেতাম ক্লাসে।

আমাদের ডিটেকটিভ বইয়ের নায়ক ও ভিলেনগুলো ছিল প্রচণ্ড ক্ষমতাবান। যতই কষ্টকর আর অসম্ভব হোক না কেন, তাদের ইচ্ছেগুলো অব-

www.pathagar.com

শেষে পূরণ হতোই। তাদের আকাংখা পূরণের অভাবে বাস্তব জীবনের মত কাহিনীর গতি কখনো শ্লথ বা আড়ষ্ট হতো না। টাকার দরকার—টাকা এসে যেতো। অস্ত্রের দরকার---অস্ত্র এসে যেতো। রহস্যের গ্রন্থি উন্মোচন প্রয়োজন---উন্মোচন হয়ে যেত। কিশোর মনের দূরন্ত বাসনার সাথে বইগুলোর ছিল অপূর্ব সখ্যতা। তাই তখন ঐ বইগুলো আমাদের জন্য ছিল সবকিছু।

কিন্তু এত মজার বইগুলোর সাথে গুরুজনদের যেন কেমন একটা বৈরী ভাব ছিল। তারা চাইতেন আমরা যেন ঐ বইগুলো না পড়ি। তারা বলতেন ঐ বইগুলোর পোকা একবার মাথায় ঢুকলে নাকি আমাদের ভবিষ্যৎ নষ্ট হবে। পরীক্ষার রেজাল্ট খারাপ হবে। গুরুজনরা মিথ্যা বলছেন-না জেনেও আমরা সে রাহুগ্রাস থেকে মুক্ত হতে পারতাম না। গুরুজনরা বলতেন ভাল বই পড়---তাতে আনন্দ ও পাবে আর জ্ঞানও বাড়বে। কিন্তু ভাল বই যে কোনগুলো তা বুঝতে আমাদের কষ্ট হতো।

আজ অনেক বছর পর এসব কথা ভাবতে গিয়ে মনে হচ্ছে—আসলেই কৈশোরে আমরা অনেকটা সময় নষ্ট করেছি। কিন্তু নষ্ট না করে উপায়ই বা কি ছিল? ডিটেকটিভ বইয়ের মত অন্য কোন বইতো আমাদের কাছে সুলভ ছিল না। গুরুজনদের কথিত ভাল বইয়ের যোগান তো তাঁরা দিতে পারতেন না। তাই ডিটেকটিভ সিরিজেরই তখন হয়েছিল জয়জয়কার।

সে যাক। ডিটেকটিভ সাহিত্য কিন্তু আমার আজকের বিষয় নয়। পত্রিকার একটি খবর পড়ে হঠাৎ করে আমার ছোট বেলার সে দস্যু বনহুর আর বাহ্‌রাম সিরিজের কথা মনে পড়ে গেল। ঐ সমস্ত বইয়ের রোমাঞ্চকর ঘটনাগুলোতো ছিল বইয়ের পাতাতেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু আজকাল অনেক ঘটনা দেখে মনে হয় ভিলেনগুলো যেন আর বইয়ের পাতায় বন্দী থাকতে চাইছে না, তারা একে একে বই থেকে রাস্তায় নেমে আসতে চাইছে।

পত্রিকায় একটি যুব সংগঠনের পরিচয়দানকারী ৬।৭ জন যুবকের একটি দলের পর পর তিনটি অপরাধমূলক ঘটনার খবর বেরিয়েছে। খবরে বলা হয়ঃ উক্ত যুবকেরা সন্ধ্যা ৭টার দিকে ঢাকার বাংলা মোটরের কাছে একটি গাড়ী থামায়। তারা ড্রাইভারের কাছে নিজেদের পরিচয় দিয়ে জোর করে গাড়ীতে ওঠে। যুবকরা ড্রাইভারকে আরো বলেছে যে, তারা একটি মিটিং-এ এসেছিল। এই গাড়ী দিয়ে তাদেরকে অফিসে পৌঁছে দিতে হবে। যুবকরা ড্রাইভারকে নানা রকম ভয় ভীতি দেখিয়ে তাদেরকে নিয়ে

www.pathagar.com

গাড়ী চালাতে বাধ্য করে। তারা এই গাড়ীতে করে শহরের বিভিন্ন রাস্তায় ঘোরাফেরা করে। এক পর্যায়ে তারা গাড়ীর জন্য একটি পেট্রোল পাম্প থেকে জোর করে বিনে পয়সায় তিন গ্যালন পেট্রোল নিয়ে নেয়।

অতঃপর উক্ত যুবকরা গাড়ী করে ধানমণ্ডি এলাকায় যায় এবং চায়না গার্ডেন নামক একটি চায়নীজ রেস্তোঁরার সামনে গাড়ী থামায়। তারা ড্রাইভারসহ চায়না গার্ডেনে গিয়ে খাবার খায়। বিল হয়েছিল প্রায় ৫শ' টাকা। লোকজনকে ভয়-ভীতি প্রদর্শন করে বিল না দিয়ে তারা চলে যায়।

পাঠকবর্গ ঘটনাটি তো পড়লেন। ঘটনাটি কি ডিডেকটিভ বইয়ের গল্পের মত মনে হচ্ছে না? গাড়ী নেই গাড়ী যোগাড় হয়ে গেল। পেট্রোল নেই তারও অভাব রইল না। খাদ্যের প্রয়োজন, খাওয়া হয়ে গেল কিন্তু বিল চুকাবার কোন ঝামেলা নেই। আসলে এদের কোন সমস্যা নেই। সাধারণ মানুষের মত এদের এতো সমস্যা থাকবে কেন? এরা যে সেই ডিডেকটিভ বইয়ের ভিলেন। এরা এখন বইয়ের পাতা থেকে রাস্তায় নামতে শুরু করেছে।

কিন্তু এই কাজগুলোকে যারা অনুচিত মনে করেন, খারাপ মনে করেন- সেই সংখ্যাগরিষ্ঠরা কি হেরে গেলেন? হেরে গেলেন আমাদের সেই কৈশোরের গুরুজনদের মত? কৈশোরে গুরুজনরাতো বিরক্ত ভাল বই সরবরাহ করতে না পেরে ডিডেকটিভ বইয়ের দোর্দণ্ড প্রতাপের কাছে হেরে গেছেন। আর এখন বাস্তবে দেখছি প্রতাপশালী ভিলেনদের মোকাবেলায় হেরে যাচ্ছেন অভিভাবক, শিক্ষক আর আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা এবং রাজনীতিকরা।

আমরা এভাবে হেরে যাচ্ছি কেন তার কারণটা একটু খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। খতিয়ে দেখা প্রয়োজন আত্মসমালোচনার দর্পণে। নতুবা আমরা হারার জন্য কাউকে না কাউকে দোষ দিয়েই শুধু ক্ষান্ত হবো— তাতে বাস্তবে কোনফায়দা লাভ করতে পারব না। আমাদের আলোচ্য যুবকরাতো ভিন্ন কোন প্রাণী নয়। তারা আমাদের মতই মানুষ-আমাদের সমাজেই বাস করে। তারা কারো সন্তান, কারো ছাত্র, কোন রাজনৈতিক দলের কর্মী এবং সর্বোপরি তারা দেশের আইনের আওতাধীন নাগরিক। এতো গুলো মানুষ এবং সংস্থার সাথে সম্পর্কযুক্ত থেকেও তারা ভিলেন হয় কি ভাবে—খারাপ হয় কিভাবে? এজন্য কি এককভাবে তারাই শুধু দায়ী,

www.pathagar.com

না অন্যদেরও কোন দায়-দায়িত্ব আছে? আমরা অভিভাবকরা কি সন্তান-দেরকে সত্যিকার মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার দায়িত্ব পালন করছি? শিক্ষকরা কি বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবেন, শিক্ষকতাকে তারা একটি মহান ব্রত হিসেবে নিয়েছেন। রাজনীতিকরা কি তাদের কর্মকাণ্ডে কর্মীদের মধ্যে মহান চেতনা উজ্জীবিত রাখতে পারছেন? আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষ কি যুবকদের সামনে অনুসরণযোগ্য উদাহরণ সৃষ্টি করতে পারছেন?

সবাই যে তাদের দায়িত্ব পালনে একেবারে গাফেল তেমনটি বলবো না। তবে অনুসরণযোগ্য উজ্জ্বল উদাহরণের সংখ্যা নিতান্তই কম। তার উপর মাঝে মাঝে এমন অনেক ঘটনা ঘটে যায় যে তখন লজ্জায় মাথা হেট হয়ে আসে। এইতো কিছুদিন আগে বিনা টিকেটে ট্রেন ভ্রমণ করার দায়ে ৫শ' শিক্ষকের কাছ থেকে জরিমানা আদায় করা হয়েছে। ঢাকায় শিক্ষক মহাসম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে ঐ সমস্ত শিক্ষাকরা ট্রেনে করে আসছিলেন। মহাসম্মেলনে যেসব শিক্ষক যোগদান করবেন তাদের কাছ থেকে সরকারী যানবাহনে অর্ধেক ভাড়া নেয়ার কথা। সম্মেলনে আসার সময় একবার টিকেট করে এলে যাবার সময় ঐ টিকেট দেখিয়ে শিক্ষকগণ যেতে পারবেন বলে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল। কিন্তু শিক্ষকগণ টিকেট ছাড়াই ট্রেনে ভ্রমণ করেন। কমলাপুর স্টেশন থেকে বের হবার সময় চ্যালেঞ্জ করলে তারা টিকেট দেখাতে ব্যর্থ হন। তখন তাঁদের কাছ থেকে পাঁচ টাকা হারে জরিমানা আদায় করে ছেড়ে দেয়া হয়।

সম্প্রতি আর একটি ঘটনা ঘটে নাটোর জেলার শিংড়া উপজেলায়। উপজেলার শিংগারদহে মাছ ধরার সময় জেলেদের প্রায় এক লক্ষ টাকা মূল্যের মাছ লুট হয়।

প্রকাশ, মাছ ধরার সময় শিংড়া উপজেলার কয়েকজন পুলিশ কনস্টেবল সেখানে হাজির হয় এবং জোরপূর্বক কয়েকটি মাছ নিয়ে যায়। তা দেখে উপস্থিত জনসাধারণও মাছ নিতে শুরু করে। ধীরে ধীরে সেখানে বহুলোক জড়ো হয় এবং লুটপাট শুরু করে।

পাঠকবর্গ, তথাকথিত ডিটেকটিভ বইয়ের মোকাবেলায় আমরা যেখানে ভাল বইয়ের যোগান দিতে পারি না, ভিলেনদের বিপরীতে আমরা যেখানে নায়ক সৃষ্টি করতে পারি না, সেখানে উপরের ঘটনাগুলো আমাদের জন্য

www.pathagar.com

কতখানি আত্মঘাতী হতে পারে তা একবার ভেবে দেখুন।

তাই অভিভাবক, শিক্ষক, রাজনীতিক, আইন শৃংখলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষ নির্বিশেষে সবার কাছে আমাদের আহবানঃ আসুন সবাই আত্মসমালোচনার দর্পণে নিজেদের ভূমিকাকে বিচার করি। এই বিচারে কোন ফাঁকি থাকলে সে চোরাবালি থেকে আমারা কেউ রক্ষা পাবনা। সবাইকে ডুবতে হবে অতল গহবরে।

রচনাকালঃ ৩রা এপ্রিল ১৯৮৪

www.pathagar.com

নিঃসঙ্গতার স্বপ্নভঙ্গ

ঢাকা শহরে যারা বসবাস করেন তাদের কাছে তো রমনা পার্ক, সোহরাওয়ার্দী উদ্যান কিংবা সংসদভবন এলাকাটি কমবেশী পরিচিত। আটপৌরে নাগরিক জীবনে যখন হাঁফ ধরে যায়, তখন তো আপনাদের অনেককেই দেখা যায় ঐ জায়গাগুলোতে। এই মুক্তাঙ্গনগুলোতে শুধুই কি মুক্ত বায়ু? অতিরিক্ত আছে আরো বর্ণালী ফুলের বাগান। তাই এক-ঘেয়েমির দুঃসময়ে এই জায়গাগুলো আমাদের কাছে বেশ স্বপ্নীল মনে হয়।

রমনা পার্ক বা সংসদভবন প্রাঙ্গণে যারা প্রায়ই যাতায়াত করেন তারা কি শুধু বর্ণালী ফুলের শোভাই লক্ষ্য করেছেন? আমার তো মনে হয় আপনারা আরো অনেক কিছুই লক্ষ্য করে থাকবেন। এই ধরুন পার্কের বেঞ্চিতে কিংবা সংসদ ভবন প্রাঙ্গণের সিঁড়ির নির্দিষ্ট জায়গায় নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তি চুপচাপ বসে আছেন। তারা কারো সাথে আলাপ করবেন না, তাদের ঠোঁট নড়বে না এবং তাদের চোখে থাকবে এক বোবা চাহনি। লোকগুলোকে দেখে অনেকেই রীতিমত ভয় পেয়ে যান।

আসলে এই লোকগুলোকে দেখে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। এরা খুবই দুঃখী মানুষ—নিঃসঙ্গ মানুষ। এই নিঃসঙ্গ মানুষদের সবাই কিন্তু দুঃস্থ বা বিপন্ন মানুষ নয়। অনেকে আছেন যারা অর্থ-সম্পদে বেশ সম্পন্ন মানুষ। এই মানুষগুলো যখন নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে তখন তাদের আর কিছুই ভাল লাগে না। সবকিছু কেমন তুচ্ছ মনে হয়। একটা অসহ্য একাকীত্ব মানুষকে তখন বেশ পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত করে রাখে। প্রশ্ন জাগতে পারে: এই জনারণ্যে থেকেও মানুষগুলো এত নিঃসঙ্গ কেন? এনিয়ে মনোবিজ্ঞানীরা বিস্তর চিন্তা-ভাবনা করেছেন। বিশেষ করে আজকের আধুনিক মানুষের মনে নিঃসঙ্গতা কেন অপ্রতিহতভাবে স্থান করে নিচ্ছে—এ বিষয়টি মনোবিজ্ঞানীদের বেশ ভাবিয়ে তুলেছে।

বিশিষ্ট মনোবিজ্ঞানীদের মতে: নিঃসঙ্গতার মূল উৎসই হচ্ছে

www.pathagar.com

পারস্পরিক মন দেয়া-নেয়ার অভাব। মনস্তত্ত্বের ভাষায় যাকে বলে Interaction বা প্রতিযোজন। মানুষের মন এই দেয়া-নেয়ার কাঙাল। আমাদের সমস্ত আচরণও এই দেয়া-নেয়াকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে। আর এই দেয়া-নেয়া বা প্রতিযোজনের বিপরীতটাই হচ্ছে নিঃসঙ্গতা। কিন্তু প্রতিযোজনের অভাবটা আকস্মিকভাবে সৃষ্টি হয় না। এটা কখনো আমরা নিজেরা সৃষ্টি করি, কখনো বা অন্যে সৃষ্টি করে। আবার বহু ক্ষেত্রে সমাজ ব্যবস্থাই নিঃসঙ্গতাকে প্রশ্রয় দেয়।

কখনো কখনো নিঃসঙ্গতা আসে এক ধরনের হীনমন্যতা থেকে। মানুষ অনেক সময় জীবনের প্রতিষ্ঠা বা সাফল্যকে যথাযথভাবে গ্রহণ করে উপভোগ করতে পারে না। মন বার বার বলে, "এ সাফল্যের তুমি যোগ্য নও।" একটা অপরাধবোধ তাকে তাড়া করে বেড়ায়। তার মনে হয়—এ যেন চুরি করা সাফল্য, এতে তার কোন গরিমা নেই। এ অবস্থায় নানা নেতিবাচক বোধ মানুষকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। এ সময় সে তার নেতিবাচক বোধগুলো নিয়ে মাত্রাধিক চিন্তিত হয়ে পড়ে। কিন্তু কারো কাছেই বা কোনভাবেই এই দুশ্চিন্তার ভার লাঘব করতে চায় না। তখন মানুষ নিঃসঙ্গ হয়ে কষ্ট পায়।

নিঃসঙ্গতার আর একটি কারণ হলো পোশাকী ব্যক্তিত্ব। মানুষ তার সাফল্যের গর্বেই হোক কিংবা অন্য কোন কারণেই হোক অনেক সময় একটা পোশাকী ব্যক্তিত্ব বজায় রাখতে গিয়ে নিজেকে স্বাভাবিক জীবন থেকে, স্বভাব থেকে ক্রমাগত বিচ্ছিন্ন করে তোলে। তথাকথিত সফল জীবন তখন তার জন্য করুণ পরিণতি ডেকে আনে।

যে মানুষ শূন্যতা বোধ নিয়ে নিঃসঙ্গ হয়ে আছে, সে প্রায়ই অভিযোগ করে, তার সঙ্গে মেশবার মত কেউ নেই। কথাটা বেদনাদায়ক হলেও সত্যি। অথচ এই একাকীত্ব নিজের অজান্তে উদাসীন আচরণ, উদাসীন মনোভাব দিয়ে সে নিজেই সৃষ্টি করেছে। সে জানে না যে, তার অফিসের বড় পদ, কোম্পানীতে কর্তৃত্ব, তার মোটা ব্যাংক-ব্যালেন্স তাকে ভিতরে ভিতরে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে আত্মীয়-পরিজন, পুরনো বন্ধু এবং প্রতিবেশীর কাছ থেকে কত দূরে সরিয়ে এনেছে।

কখনো কখনো মানুষের মনে চাওয়াটা এত বেশী হয়ে যায় যে, তখন আর তা পূর্ণ করা যায় না। সে ভাবে সে কিছু দিক না দিক সকলেই

www.pathagar.com

তাকে সব কিছু উজার করে দেবে। যেন এই পাওয়াটা তার একটা স্বাভাবিক অধিকার। কিন্তু পেতে হলে তো কিছু দিতে হবে। এটাই তো নিয়ম। কিন্তু অনেকেই এটা বুঝতে চায় না। চেয়ে না পেয়ে সে ভাবে, আমি এর থেকে তো পাচ্ছি না তা হলে ওর কাছ থেকেও পাব না। এইভাবে সামাজিক দেয়া-নেয়ার মূল কথাটা ভুলে গিয়ে অনেকে নিজের দোষেই আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়ে।

আগে আমাদের সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে নিয়ম, রীতি বা প্রথাগুলো যেরকম পাকাপোক্ত তথা সুস্থির ছিল, আজ আর তা নেই। এখন সমাজ-বন্ধন ক্রমশ শিথিল হয়ে যাচ্ছে। এই শিথিল সমাজ বন্ধন পরিবারের সদস্যদের মধ্যে একটা শূন্যতার সৃষ্টি করে। আর এই শূন্যতা যাদের কষ্ট দেয়, চিন্তিত করে তারাই নিঃসঙ্গতার শিকার হয়ে পড়ে।

এই শিথিল সমাজবন্ধনের ফলেই আজ ডিভোর্স বেড়েছে, আত্মহত্যা বেড়েছে। মনোবিজ্ঞানের পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, বিবাহিতের চেয়ে অবিবাহিতদের মধ্যেই আত্মহত্যার সংখ্যা বেশী।

এদিকে একান্নবর্তী পরিবার সমাজ থেকে ক্রমশ মুছে গিয়ে দেখা দিচ্ছে নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি বা ছোট পরিবার। ফলে পরিবারের ছেলে-মেয়েরা আগে পারস্পরিক দেয়া-নেয়ার যে একটি সুযোগ পেত তা এখন দুর্লভ হয়ে উঠেছে। আর এই দেয়া-নেয়ার সীমিত সুযোগে সৃষ্টি হচ্ছে নিঃসঙ্গতা।

আমাদের এই উপমহাদেশে নিঃসঙ্গতা নামক মানসিক অসুখটি এখনো তেমন প্রকট আকার ধারণ করেনি। কিন্তু বস্তুবাদী পাশ্চাত্যে এ রোগ বেশ প্রকট। উদাহরণ হিসেবে আমরা আমেরিকার কথা আলোচনা করতে পারি। আমেরিকায় একক জীবনযাপনে অভ্যস্ত মানুষের সংখ্যা নগন্য নয়। ১৯৫০ সালে ইচ্ছাকৃতভাবে অথবা পরিস্থিতির চাপে যারা একা থাকতেন তাদের সংখ্যা ছিল ৪০ লাখের মত। এখন সেখানে ১ কোটি ৯০ লাখেরও বেশী মানুষ একক জীবনযাপন করছেন।

কিন্তু কেন তারা একা থাকছেন? প্রথমত বিবাহ বিচ্ছেদ এদেশে এত বেশী যে, জোড়ভাঙ্গা স্বামী-স্ত্রী দ্বিতীয়বার অন্য কাউকে বিয়ে না করা পর্যন্ত বা বিয়ের ইচ্ছে না থাকলে একা থাকাই পছন্দ করেন। বিধবা বা ডিভোর্সি মেয়ে বাপের বাড়ী ফিরে আসবেন—মার্কিন মেয়েদের এমন মানসিকতা নেই।

www.pathagar.com

অধিকাংশ আমেরিকান বৌ তাঁর অধিকারে বোধ সম্পর্কে বড় বেশী সচেতন। কোন বিষয়ে একটু অবহেলা মানে গৃহবিবাদের সূত্রপাত। এইসব ভেবে অনেকে বিয়ে এড়াতে চান।

যুক্তরাষ্ট্রে একলা স্বভাবের এমন অনেক যুবতীও আছেন—ভাল রোজগার, কর্মজীবনে ব্যস্ততা, উন্নতির সোপান তাদের এমনই আকর্ষণ করেছে যে, তারা আর স্বামী, সংসার এবং ছেলে-মেয়ে মানুষ করার ঝক্কি পোহাতে চায় না। তাদের কামনা, ৩০ বছর পর্যন্ত অন্তত স্বাধীনতার সুখ বজায় থাক, তারপর দেখা যাবে।

কিন্তু নিঃসঙ্গতা যারা স্বেচ্ছাকৃতভাবে চাননি তাদের জন্য এটি বড় কষ্টকর অভিজ্ঞতা। চাকরির পরও জীবনযাত্রার অনেক কাজ ঘাড়ে এসে চাপে। রোগে-শোকে তাদের অংশীদার বলে কেউ থাকে না। তাঁর কাছে সঙ্গী, সাহচর্য, সাহায্যের অভাবে প্রতিটি দিনই ক্লান্তিকর।

আর যুক্তরাষ্ট্রের সমাজ ব্যবস্থায় বৃদ্ধ আত্মীয়-স্বজনদের জন্য আত্মীয়তা, সামাজিকতা ও লৌকিকতার তেমন প্রচলন নেই। তাই সেখানে বৃদ্ধ মামা জ্যেঠা, খালা, ফুফুদের ছুটির দিনে গির্জা আর নিজের ডেরায় বসে থাকা ছাড়া উপায় থাকে না।

যুক্তরাষ্ট্রে সমাজ বিজ্ঞানীরা সমীক্ষা নিয়ে দেখেছেন—যারা ইচ্ছাকৃত ভাবে যৌবনকালে একা কাটিয়েছেন তারাই কিন্তু বার্ধক্যে একাকীত্ব নিয়ে বেশী বিচলিত হয়ে পড়েন। তার চেয়ে কম বিচলিত হন ডিভোর্সিরা। আর নিঃসঙ্গতার মধ্যেও সমাহিত থাকেন বৃদ্ধ-বিপত্নীক বা বৃদ্ধা বিধবারা।

এ অবস্থার মধ্যেও যুক্তরাষ্ট্রের অনেকে শখ বা হবিকে আঁকড়ে ধরে, কেউ বা বয়-স্কাউটে কাজ করে কেউবা স্বেচ্ছাসেবী বাহিনীতে যোগ দিয়ে নিঃসঙ্গতার একঘেয়েমি কাটাতে তৎপর হয়েছেন। কোন কোন বৃদ্ধা মহিলা তো হোটেলে বা মোটেলে বেবি সিটিং-এর কাজ নিয়ে আনন্দ পাচ্ছেন। ছোটদের সঙ্গ দিয়ে তাদের নিঃসঙ্গ সময় বেশ ভালই কাটছে।

আসলে নিঃসঙ্গতা মানুষের কোন অনিবার্য পরিণতি নয়। মানুষ ইচ্ছে করলেই এই মানসিক রোগ থেকে রেহাই পেতে পারে।

যেমন, কী পাইনি এই হিসেব না মিলিয়ে আমরা যদি যা পেয়েছি তাতেই খুশী থাকতে পারি তা হলে তো আমাদের আপদ কমে আসবে।

আর জীবনের নেতিবাচক বোধগুলো নিয়ে মাত্রাধিক চিন্তিত না হয়ে

www.pathagar.com

আমরা যদি প্রয়োজনমত ত্রুটি-মোচনে এগিয়ে আসতে পারি তা হলেই তো আমাদের জীবনটা পাল্টে যায়।

নিঃসঙ্গতা দূর করার আর একটা পদক্ষেপ হল নিজের জন্মগত, স্বভাবগত কোন সমাজসম্মত কাজ বা খেয়াল নিয়ে অবসর সময়ে ব্যস্ত থাকা।

অনেকে বলেন, আর্থসামাজিক অসচেতনতাই নিঃসঙ্গ বোধের জন্ম দেয়। তাদেরর মতে সমাজ সচেতন কোন ব্যক্তি নিঃসঙ্গ হতে পারে না।

আবার অনেকে বলেনঃ ঐশ্বরিক বোধ যার মধ্যে আছে তিনি নিঃসঙ্গ হন কিভাবে?

আর মুসলমানের পক্ষে নিঃসঙ্গ হওয়া সম্ভব কিনা তা আমার বোধে আসে না। কারণ কোরআনে মুসলিমদের উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছেঃ "তোমরা হলে সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত। তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে সমগ্র মানব জাতির জন্য। তোমরা ন্যায়ের আদেশ করবে ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করবে।" এ দায়িত্ব যাদের উপর বর্তায় তারা নিঃসঙ্গ থাকে কিভাবে?

সে যাক, মতস্তত্ত্ববিদরা বলেনঃ অ্যালকোহল, সিগারেট বা স্নায়ু উত্তেজক ওষুধের সাহায্যে নয়, ঘুমের ওষুধের নির্ভতায় নয়, হালকা কাজ-কর্মের মধ্যে এবং বাইরের জগতে কিছু সময়ের জন্য এলে তবেই নিঃসঙ্গ মানুষ আবার আনন্দ ফিরে পাবেন। আসলে নিঃসঙ্গতা থেকে মুক্তি পেতে প্রয়োজন চার পাশের ভ্রান্তির দেয়াল ভেঙ্গে বাইরের আলো-ঝলমল কর্মমুখর পৃথিবীতে বেরিয়ে আসা।

রবীন্দ্রনাথও বোধ হয় জীবনের স্বর্ণসময়ে এসত্যটি বুঝতে পেরে-ছিলেন। তাই তো তার 'প্রভাত সঙ্গীতে' নিঃসঙ্গতার অন্ধকার কেটে গিয়ে সমগ্র বিশ্বের আলো এসে কবিচিত্তকে আলিঙ্গন করেছে। আর এর ফলশ্রুতিতে 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'তে কবি লিখলেনঃ আজি এ প্রভাতে রবির কর/কেমনে পশিল প্রাণের পর/কেমনে পশিল গুহার আঁধারে প্রভাত পাখির গান/না জানি কেন রে এত দিন পরে জাগিয়া উঠিল প্রাণ/জাগিয়া উঠিছে প্রাণ ওরে উথলি উঠেছে বারি/ওরে প্রাণের বেদনা প্রাণের আবেগ রুধিয়া রাখিতে নারি।

রবীন্দ্রনাথের নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের মত আমাদেরও নি:সঙ্গতার স্বপ্নভঙ্গ হোক এই কামনা করেই এই লেখার ইতি টানছি।

রচনাকালঃ ২১ জুলাই ১৯৮৫

www.pathagar.com

অভ্যর্থনা জানালেন অমিতাভ বচ্চন

বাসাটায় ঢুকেই বারান্দার সুইচবোর্ডে লক্ষ্য করলাম চিত্রতারকার একটি ছবি, উজ্জ্বল নয়নে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। মুখে তার মিষ্টি হাসি। এ যেন অতিথি অভ্যর্থনার এক নতুন টেকনিক। বাড়ির ভিতরে ঢুকেদেখলাম সে চিত্রতারকা এখানে আরো মর্যাদার আসনে সমাসীন। ড্রেসিং টেবিলের লম্বা আয়নাটির দু পাশে সেই বিশেষ চিত্র তারকার প্রায় ৮।১০টি ছবি বিচিত্র ভঙ্গিতে ফুটে আছে।

চলচ্চিত্র জগতের যারা খোঁজ খবর রাখেন তারা হয়তো এতক্ষণে টের পেয়ে গেছেন ছবিটি কার। হ্যাঁ, ছবিটি এই উপমহাদেশের এখনকার সব চাইতে দামী চিত্রতারকা অমিতাভ বচ্চনেরই। বাসার সদস্যারা বেশ সমাজ সচেতন বলেই মনে হল। তাই এই নারী প্রগতির যুগে শুধু পুরুষ চিত্রতারকার ছবির কদর করেই তারা ক্ষান্ত ছিলেন না। নারী চিত্রতারকার ছবিও এখানে পেয়েছে যথার্থ সম্মান। আর তাইতো অনুজ্জ্বল দেয়ালে খচিত হয়ে আছে বোম্বের স্বনামধন্যা চিত্র তারকা রেখার অত্যুজ্জ্বল পোস্টারটি। ড্রইং রুমে বসে অভ্যাসমত টিপয়ের উপর রাখা পত্র-পত্রিকার দিকে হাত বাড়ালাম। প্রথমেই হাতে আসলো 'ফিল্ম ফেয়ার'। পত্রিকাটিতে লেখার চাইতে ছবির প্রাধান্যই যেন বেশী। লেখার উপর চোখ রাখা গেলেও কিন্তু ছবির উপর আর চোখ রাখতে পারলাম না। বাধ্য হয়ে আর একটি পত্রিকার দিকে হাত বাড়ালাম। এবার হাতে আসলো 'স্টার ডাস্ট'। এটিও সেই একই ঢঙের সিনে-পত্রিকা। তাই আবারো হাত বাড়ালাম। এবারে হাতে আসলো 'শোটাইম'। ব্যতিক্রম কিছু নয়, এটিও সেই একই ধাঁচের সিনে-পত্রিকা। বলা বাহুল্য, ইংরেজী ভাষার এই সিনেমা পত্রিকা তিনটিই বোম্বে থেকে প্রকাশিত। পর পর তিনবার চেষ্টা করেও আমা হেন বেরসিক জন সুখপাঠ্য কোন পত্রিকা না পেয়ে বোধহয় কিছুটা বিরক্ত হয়েই গেলাম। তাই এবার সোফা ছেড়ে টিপয়ের কাছে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসলাম। বোম্বের সিনে পত্রিকার ভীড়ে এবার একটি বাংলা পত্রিকা পেয়ে খুশী মনে

www.pathagar.com

সোফায় এসে বসলাম। কিন্তু পড়তে গিয়ে হোঁচট খেলাম। এই 'তারকা-লোকে'ও বোম্বের সেই তারকালোকেরই প্রভাব। আসলে বিশেষ দেশকে আর বিশেষ পত্রিকাকে দোষ দিয়ে লাভ কি। সবাই যেন একই বৃত্তে বাঁধা পড়ে গেছে। পাশ্চাত্যের যা সৃষ্টি তাইতো ভায়া বোম্বে-কলকাতা হয়ে আমাদের দেশে অনুকৃত হচ্ছে। উৎসে যদি ভুল থাকে তবে তো তার প্রভাব শাখাউপশাখা সব যায়গাতেই পড়বে। এতে আর আশ্চর্য হওয়ার কি আছে। তাই বোধহয় বর্তমান সভ্যতার শাসক পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী ও ভোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সবচাইতে উলঙ্গ প্রকাশ ঘটছে এই উপমহাদেশের সিনেমা আর সিনেমা পত্রিকাগুলোতে।

হঠাৎ আমার ভাবনায় ছেদ পড়ে গেল কয়েকটি শিশুর কলকাকলীতে। দেখলাম কি নিয়ে যেন ওদের মধ্যে একটা কাড়াকাড়ি কাণ্ড। একজন তো অভিযোগ করে বললোঃ দেখুন না ওরা কেমন জোর করে আমার ভিউকার্ডগুলো কেড়ে নিতে চাচ্ছে। ভিউকার্ডের নাম শুনে আমারও কেমন যেন একটু দেখার লোভ হলো। বললামঃ 'কই, দেখি তো তোমার ভিউ-কার্ডগুলো কেমন। কিন্তু ভিউকার্ড দেখে তো আমার চক্ষু স্থির। এ আবার কেমন ভিউকার্ড! ছোট বেলায় তো আমাদের হাতে থাকতো বিভিন্ন দেশের ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থানের ছবি সম্বলিত ভিউকার্ড। তখন ভিউকার্ডের মধ্যমে অনেকটা বিশ্বভ্রমণ হয়ে যেত। কিন্তু এখন? এখন তোশিশুদের হাতের ভিউকার্ডগুলোতে দেখছি সিক্স মিলিয়ন ডলার, বায়োনিক উইম্যান, অমিতাভ, রেখা, শ্রী দেবী, সাবানা আজমী, জীতেন্দ্র, রাজ্জাক আর ববিতার ছবি। এ যেন পাশ্চাত্য, ভারত আর বাংলাদেশের চিত্র তারকাদের এক আন্তর্জাতিক সমাবেশ। আর তাই দেখা নিয়ে এত কাড়াকাড়ি।

ভিউকার্ড নিয়ে শিশুদের এই কাড়াকাড়ি দেখে কিছু কিশোর আর তরুণের চেহারা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। ওদের দেখেছি চিত্র তারকাদের নিজেদের পরিচ্ছদের সাথে একাকার করে নিতে। কারো হয়তো গেঞ্জির সামনের দিকে অমিতাভের ছবি, কারো হয়তো গেঞ্জীর পিছনের দিকে মাইকেল জ্যাকসনের ছবি। চিত্র তারকাদের বয়ে বেড়ানো যেন একটা গৌরবের কাজ। অথচ এক সময় দেখতাম সার্কাসের ক্লাউন বা বিভিন্ন বিড়ি কোম্পানীর জোকাররাই এ ধরনের নানা ছবির পোশাক পরে সং সেজে দর্শকদের আকৃষ্ট করতে চেষ্টা করতো। আর এখন শিক্ষিত ও প্রগতিবাদীরাই (?) সাজছে সেই সং!

www.pathagar.com

আসলে এখনকার তরুণ-তরুণীরা চিত্রজগত দ্বারা দারুণভাবে প্রভাবিত। তাদের কাছে এখন আর জাতীয় নেতারা হিরো নন। চিত্র তারকারাই যেন এখন তাদের মনোজগতের অধীশ্বর। তাই তারা এখন চিত্র তারকাদের দেখতে চান গৌরবময় সব আসনে। রাজনীতিও তার অন্তর্ভুক্ত। ভারতের সাম্প্রতিক পার্লামেন্ট নির্বাচন তার বড় প্রমাণ। এই নির্বাচনে তো কয়েকজন চিত্র তারকা বেশ সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন। তবে এদের মধ্যে রাজনীতিতে নবাগত অমিতাভ বচ্চন বোধ হয় সবচাইতে বেশী সাড়া জাগিয়েছেন। জনগণ বিশেষ করে তরুণরা তো তাকে ভোটদিয়েছে তাদের সেই স্বপ্ন রাজ্যকে ফিরে পেতে। তারা হয়তো ভেবেছিল অমিতাভ তাদের 'সব পেয়েছির দেশ' এনে দেবে। কারণ ছবিতে তো অমিতাভ তাই পেরেছেন। তার কাছে তো কোন সমস্যাই সমস্যা নয়।

কিন্তু হালে তরুণদের সেই স্বপ্ন বুঝি ভাঙতে বসেছে। নয়াদিল্লী থেকে রয়টার আমাদের সে খবর দিয়েছে। রয়টারের ভাষ্য অনুযায়ী সিনেমার পর্দায় ৪২ বছর বয়স্ক সুপারস্টার অমিতাভ নিজেকে যেভাবে গ্রহণীয় করে তুলেছিলেন, রাজনৈতিক মঞ্চে তা করতে সক্ষম হননি।

ভারতের সর্বাধিক জনপ্রিয় চিত্র তারকা অমিতাভ গত বছর নির্বাচনে লড়তে নামলে তাকে কংগ্রেস (আই) এর সবচেয়ে উদ্দীপ্ত নতুন রিক্রুট বলে গণ্য করা হয়েছিল। এরপর তিনি তার অভিনীত 'ক্ষুব্ধ তরুণ'-এর চরিত্র গুলোর একটির মতই প্রবীণ রাজনীতিক এইচ এন বহুগুণাকে বিপুল ভোটে পরাজিত করে এলাহবাদের আসনে নির্বাচিত হন।

তার ভক্তরা আগ্রহভরে অপেক্ষা করছিল এই আশায় যে, অমিতাভ তার অভিনীত সাম্প্রতিক চরিত্রটির মতই পার্লামেন্টকে আলোকিত করবেন। সাম্প্রতিক ওই ছবিতে অমিতাভ এক রাজনীতিকের ভূমিকা রূপায়িত করেন। ছবির অমিতাভ মন্ত্রিসভায় তার সহকর্মীদের মেশিনগানের গুলীতে বিদ্ধ করেন। কারণ, তারা ছিল দুর্নীতিবাজ।

কিন্তু ভক্তরা বেহুদা অপেক্ষা করছিলেন। অমিতাভ বাস্তবে তার কিছুই করলো না। এমনকি পার্লামেন্টে বক্তৃতাও দিল না।

তাই গত মার্চে রাজ্য বিধান সভার নির্বাচনকালে এলাহাবাদ গেলে তাঁকে লক্ষ্য করে টমেটো ছোড়া হয়। এরপর বিক্ষুব্ধ নাগরিকদের একটি দল তাদের অনুপস্থিত প্রতিনিধিকে খোঁজার কাজে পুলিশের সহায়তা চেয়ে রিপোর্ট

www.pathagar.com

পেশ করেন। এতে বলা হয়ঃ আইন-শৃঙ্খলার অভাব ও নির্যাতনের কবলে পড়ে স্থানীয় জনগণ কাতরাচ্ছে। কিন্তু আমরা আমাদের পার্লামেন্ট সদস্যকে ৩৬ ঘন্টা ধরে খুঁজেও পাচ্ছিনা।

অমিতাভ তালগোল পাকিয়ে গত মে মাসে টাইম অব ইণ্ডিয়া পত্রিকাকে বলেনঃ আমি রাজনীতির ময়লা ডোবায় পড়েছি।

কংগ্রেস (আই)-এর জনৈক সিনিয়র সদস্য তখন ক্ষিপ্ত হয়ে বললেনঃ রাজনীতি যদি ময়লার ডোবা হয়ে থাকে তবে ঐ ডোবা ছেড়ে চলে যাবার জন্য আমি মিস্টার বচ্চনকে অনুরোধ জানাই।

অমিতাভ রাজনীতি ছেড়ে চলে যাবেন কি না তা আমরা জানি না, তবে তার বাল্যবন্ধু প্রধান মন্ত্রী রাজীব গান্ধী যে রাজনীতি থেকে সহসা বিদায় নিচ্ছেন না সে ব্যাপারে আমরা প্রায় নিশ্চিত।

রাজীব গান্ধীও কিন্তু গত নির্বাচনে নানা আশাবাদ শুনিয়েছেন। কিন্তু দুর্মুখরা তাকে নিছক নির্বাচনী চমক বলেই বর্ণনা করেছেন। গত ফেব্রুয়ারীর নির্বাচনে রাজীব গান্ধী বলেছিলেন তিনি দেশ থেকে কালো টাকা উদ্ধার করবেন। হালে এই বিষয়টি নিয়ে ভারতের পত্র-পত্রিকায় বেশ আলোচনা হচ্ছে।

কোন কোন পত্রিকা তো বলছেঃ রাজীব গান্ধী জেনেও কালো টাকা উদ্ধার করতে পারবেন না, রুখতেও পারবেন না। কালো টাকা এদেশে যে রকম সমান্তরাল অর্থনীতি গড়ে তুলেছে তেমনি থাকবে। আর এতে দেশের অর্থনীতি শুধু ভেঙ্গেই পড়বে না, ভয়াবহ পরিণতির দিকে এগিয়ে যাবে। আর এর জন্য দায়ী দিল্লীর সরকার। স্বাধীনতা পরবর্তী কালে সাড়ে চারটি বছর বাদ দিলে রাজীবের পণ্ডিত দাদা মশাই জওহর লাল নেহেরু ও মা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এই বিরাট দেশ শাসন করেছেন। তাঁর 'দাদা' মশাই ও মা যা পারেননি তাঁর দ্বারা সে কাজ কি করে সম্ভব হবে? শুধু আস্ফালনে কাজ হয় না।

পত্রিকায় আরো বলা হয়ঃ তাঁর দাদা মশাই কোলকাতার শ্রদ্ধানন্দ পার্কে ১৯৪৫ সালে এক জনসভায় বলেছিলেন, আমার হাতে ক্ষমতা থাকলে I shall hang the black marketers against the nearest lamppost. সেই পণ্ডিতজী যখন ক্ষমতায় এলেন তখন তিনি কি করলেন? তিনি সেই চোরাকারবারী, ব্যবসায়ী, শিল্পপতির সঙ্গেই আপোস করে প্রায় সতের বছর দেশ শাসন করেছেন।

www.pathagar.com

পত্রিকায় আরো বলা হয়ঃ কালো টাকার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে গেলে আমলারাই রাজীবের সব পরিকল্পনা ভেস্তে দেবে। এই কাজ করতে গেলে তাঁকে ব্যবসায়ীদের কাছে শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণ করতে হবে। না হলে ক্ষমতা থেকে সরে যেতে হবে। এরাই তো ভারতের শাসনতন্ত্র নিয়ন্ত্রণ করছে। এদের অঙ্গুলি হেলনে সরকারের থাকা না থাকা নির্ভর করে। এরাই মুঠো মুঠো টাকা খরচ করে এম এল এ, এম পি বানায়, তৈরী করে মন্ত্রী। এদের প্রভাব দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক তথা সর্বক্ষেত্রে। কাজেই এদের হাত থেকে রাজীব দেশকে মুক্ত করবেন কোন শক্তিতে?

এ প্রশ্ন আমাদেরও। শুধু ভারতের ক্ষেত্রেই নয়, এ প্রশ্ন স্বদেশ, বিদেশ কি বিশ্ব---সবার ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য।

বিষয়টি চিত্র তারকাদের ফ্যানরাও একটু ভেবে দেখবেন কি? দেখলেন তো আপনাদের স্বপ্নের সেই দেশ গড়তে অমিতাভ বচ্চন কি দারুণ ভাবেই না ব্যর্থ হয়েছেন। ছায়াছবিতে যা সম্ভব বাস্তবে তা যে সুকঠিন তার সাক্ষী তো অমিতাভ বচ্চনের বন্ধু রাজীব স্বয়ং।

কিন্তু ইতিহাস তো আমাদের বলে, কালো ছায়া থেকেও দেশকে রক্ষা করা সম্ভব এবং দেশ স্বপ্নের দেশেও পরিণত হতে পারে। কিন্তু কিকরে? সে কথা জানতে চলুন না চৌদ্দ শ' বছর আগের সে আরব দেশে। কম শিক্ষিত হয়েও কম প্রযুক্তির মালিক হয়েও তারা স্বদেশকে স্বপ্নের দেশে পরিণত করেছিলেন। আর তারা সে অবিশ্বাস্য কাণ্ডটি ঘটাতে পেরেছিলেন ঐশী আলোকে ভ্রান্ত বিশ্বাসকে, দর্শনকে পরিবর্তন করেই। আজকের বিশ্বেও আমরা সেই বিপ্লব ঘটাতে পারি জীবন দর্শনের তথা চিন্তার পরিশুদ্ধির মাধ্যমেই। আমরা যদি আমাদের জীবন দর্শনকে পরিশুদ্ধ করে নিতে পারি তাহলে সেই 'সব পেয়েছির দেশ' পেতে আমাদের আর বোধ হয় কোন সুপার-স্টারের প্রয়োজন হবে না।

রচনা কাল ঃ ১৪ জুলাই ১৯৮৫

www.pathagar.com

কবিতা ও রাজনীতি এবং হায়রে প্রবন্ধ

দ্বিতীয় জাতীয় কবিতা উৎসব বেশ জমজমাটভাবেই শেষ হলো। বহুল সংখ্যক নবীন ও প্রবীন কবি এ উৎসবে অংশগ্রহণ করেন। কবিতা উৎসবের জমজমাট এই আসরে সেমিনারেরও আয়োজন করা হয়। উৎসবের দ্বিতীয় দিনে আয়োজিত সেমিনারের বিষয়বস্তু ছিল 'কবিতা ও রাজনীতি।'

সেমিনারে আলোচকবৃন্দ তাঁদের বক্তব্যে বলেন: কবিতা ও রাজনীতি হাত ধরাধরি করে একটি অনন্য শিল্প হয়ে উঠতে পারে। বাংলাদেশের কবিরা তা প্রমাণ করেছেন। এদেশের রাজনীতি ও কবিতাকে অনেক সমৃদ্ধ করেছে। সেমিনারে আলোচকবৃন্দের এই যে অভিমত, তার সাথে বোধ হয় আমরা সবাই আপন আপন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সহ কম বেশী একমত হতে পারি। বিশেষত কবিতা ও রাজনীতির বৃন্ত রচনায় নজরুলের পারঙ্গমতার উজ্জ্বল উদাহরণের পর এ বিষয়ে বোধ হয় দ্বিমত পোষণ করার আমাদের তেমন অবকাশও নেই। তাই এ বিষয়ে নতুন করে কলম না ধরলেও চলতো। কিন্তু গোল বাধিয়েছেন সেমিনারের মূল প্রবন্ধকার। 'কবিতা ও রাজনীতি' শীর্ষক প্রবন্ধ রচনা করতে গিয়ে তিনি এমন তাল গোল এবং ভ্রান্তির বেড়াজাল সৃষ্টি করেছেন যে, সে বিষয়ে কিছু না বললেই নয়।

প্রবন্ধকার সম্পর্কে লিখতে গিয়ে হঠাৎ করেই আমার মনে পড়ে গেল অনেক দিন আগের একটি ঘটনা। আমার এক তরুণ বন্ধু বিশেষ ধরনের একটি কবিতা সংকলন প্রকাশ করতে চান। আর সে উপলক্ষেই তিনি তখন বেশ ব্যস্ত। ব্যস্ততার এক পর্যায়ে আমাকে নিয়ে গেলেন তদানীন্তন 'দৈনিক পাকিস্তান' কার্যালয়ে। উদ্দেশ্য কবি শামসুর রাহমান থেকে সে বিশেষ কবিতা সংকলনটির জন্য একটি কবিতা সংগ্রহ করা। কক্ষে ঢুকে দেখি আরো দু'জন কবি পরিবেষ্টিত হয়ে কবি শামসুর রাহমান বসে আছেন। আমার বন্ধু প্রবর তার উদ্দেশ্য খোলাসা করে বলতেই শামসুর রাহমান ভ্রূ কুঞ্চিত করে বললেন: 'যৌনিজ কবিতা সংকলন'! ব্যাপারটা আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। পাশে উপবিষ্ট জনৈক কবি বললেন:

www.pathagar.com

রাহমান ভাই, আসল ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন না? ওনার উদ্দেশ্য কিন্তু কবিতা টবিতা নয়, একটা চমক সৃষ্টি করাই হলো আসল লক্ষ্য। বলা বাহুল্য, এমন বিরূপ মন্তব্যের পর সে নামে কবিতা সংকলন প্রকাশের খায়েশ আমার বন্ধুর মিটে গিয়েছিল।

'কবিতা ও রাজনীতি' শীর্ষক প্রবন্ধে প্রবন্ধকারের বিভিন্ন তালগোলে মন্তব্য দেখে আমার সেই বন্ধুর কথাই এখন মনে পড়ছে। আসলে প্রবন্ধ টবন্ধ নয়, বিভিন্ন প্রান্তিক কথাবার্তা বলে একটা চমক সৃষ্টিই যেন তার আসল উদ্দেশ্য। যাদের অন্তরে উদ্দেশ্যমূলক স্থূলতা কিংবা সস্তা জনপ্রিয়তার আকাংখা প্রবল থাকে তাদের কাছ থেকে এ ধরনের অসাহিত্যিক সুলভ আচরণ ছাড়া আর কিইবা আশা করা যেতে পারে।

উক্ত ডক্টর-প্রবন্ধকারের সস্তা জনপ্রিয়তার যে খায়েশ ছিল তাও কিন্তু পূরণ হলো না। বেচারার ভাগ্য বৈরীই বলতে হবে। তা না হলে এত কষ্টে সৃষ্টে তিনি যে প্রবন্ধ রচনা করলেন তা শ্রবণে শ্রোতাকুল হৃষ্ট না হয়ে রুষ্ট হয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করতে যাবে কেন? আর আলোচকরাই বা বলতে যাবেন কেনঃ 'এটি ভুল শিরোনামের চমৎকার প্রবন্ধ। প্রবন্ধটি পরস্পর বিরোধিতায় পূর্ণ।' আর কেনই বা জনৈক আলোচক বলবেনঃ প্রবন্ধকারের দৃষ্টিভঙ্গি সীমাবদ্ধ এবং দার্শনিক ভিত্তিশূন্য। প্রবন্ধকারকে শুধু এই বিরূপ মন্তব্যই সহ্য করতে হয়নি, তাকে নীরবে আরো দেখতে হয়েছেঃ শ্রোতারা তার প্রবন্ধ শুনে হাততালি না দিলেও কিন্তু তার সমালোচনাকারীদের বেলায় সমানে তালি দিয়ে চলেছে। প্রকাশ্যে সম্মানিত আসনে উপবিষ্ট থেকে এ দৃশ্য হজম করাও কি কম মর্মপীড়ার বিষয়। তাই বলছিলাম ডক্টর-প্রবন্ধকারের ভাগ্য সেদিন বৈরীই ছিল।

কিন্তু তাঁর প্রবন্ধে এমন কি ছিল যাতে শ্রোতাকুল বিক্ষুব্ধ হয়ে গেল? প্রবন্ধে তিনি বলেছিলেনঃ বাংলা ভাষার সবচেয়ে বিশুদ্ধ ও পরম রোমান্টিক কবি রবীন্দ্রনাথ ছিলেন আমৃত্যু রাজনীতিপ্রবণ। আর কবি নজরুল সম্পর্কে তিনি বলেনঃ 'নজরুল কোন রাজনৈতিক বিশ্বাসে অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিলেন না। তাঁর বিশ্বাসের মধ্যে গলদ ছিল। তাঁর কবিতার বিরাট অংশই প্রতিক্রিয়াশীল। নজরুল গবেষকদের অধিকাংশই প্রতিক্রিয়াশীল। তা থেকেও প্রমাণিত হয় যে, তিনি প্রতিক্রিয়াশীলদের কবি।'

তাঁর বক্তব্য শুনে মনে হয়, বাংলা সাহিত্যের তিনিই যেন একমাত্র পাঠক। আর কেউ-ই যেন বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠাগুলো নেড়ে চেড়ে দেখেননি।

www.pathagar.com

নইলে এমন দেশছাড়া কথা তিনি উচ্চারণ করলেন কি ভাবে। রবীন্দ্রনাথ বড় কবি, শুদ্ধ কবি—একথা তো কারো স্বীকৃতির অপেক্ষায় থাকে না। আমার মনে হয় কোন সুস্থ ব্যক্তিই রবীন্দ্র প্রতিভাকে ছোট করে দেখে নিজে ছোট হতে চাইবেন না। কিন্তু তাঁর রাজনীতি প্রবণতা? রাজনীতির পদ্ধতি প্রসঙ্গে, দেশ ও সমাজ পরিচালনার কাঠামো সম্পর্কে তিনি যে প্রয়োগিক মতামত প্রকাশ করেছেন, তার সাথে আমাদের কেউ একমত হতে পারেন আবার কেউ দ্বি-মতও পোষণ করতে পারেন। কিন্তু তাঁর রাজনৈতিক নায়ক নির্বাচন প্রসঙ্গে প্রবন্ধকার কি বলবেন? তিনি কি রবীন্দ্রনাথের মত শিবাজীকেও আমাদের রাজনৈতিক নায়ক মেনে নিতে অনুপ্রাণিত করবেন? আসলে রাজনৈতিক প্রবণতায় রবীন্দ্রনাথ শুদ্ধ ছিলেন না, বাঙালী মুসলমানদের জন্য চিন্তা-ভাবনায়ও তিনি তেমন অভ্যস্ত ছিলেন না। আর তা নিয়ে আমাদের তেমন মাথা ব্যথাও নেই। মাথা ব্যথা নেই প্রবন্ধকারেরও বোধ হয়। তাই তো তিনি কোন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ধারে কাছে না গিয়ে এক কথায় বলে গেলেনঃ রবীন্দ্রনাথ ছিলেন আমৃত্যু রাজনীতি প্রবণ।

কিন্তু নজরুলকে নিয়ে তাঁর এত অপপ্রয়াস কেন? নজরুলকে খাটো করতে তিনি এত উল্লসিত কেন? নজরুলের কাব্যে তিনি প্রতিক্রিয়াশীলতার বটবৃক্ষ খুঁজে পেলেন কিন্তু রাজনৈতিক অঙ্গীকারের লতাপাতাও খুঁজে পেলেন না কেন? নজরুলের বৃটিশ বিরোধী ভূমিকা ও জেল-জরিমানার ভোগান্তিও কি তাঁর রাজ নৈতিক অঙ্গীকারের পরিচায়ক নয়? আর প্রতিক্রীয়াশীলতা! এ-প্রসঙ্গে নিজের বক্তব্য বাদ দিয়ে সে দিনের সেমিনারের সভাপতির বক্তব্যই উদ্ধৃত করতে চাই। সে দিনের সভাপতি তাঁর ভাষণে বলেনঃ 'নজরুলের কবিতার কোন অংশই প্রতিক্রিয়াশীল নয়। ধর্মকে নিয়ে কবিতা লেখা প্রতিক্রিয়াশীলতা নয়।' আর পাঠকবৃন্দও নিশ্চয়ই আমার সাথে একমত হবেন যে, নজরুলকে প্রতিক্রিয়াশীল বললে, পৃথিবীতে বোধ হয় এ বিশেষণের আওতা থেকে আর কেউ-ই বাদ যাবেন না।

তাহলে প্রবন্ধকার নজরুলকে প্রতিক্রিয়াশীল বলতে গেলেন কেন? এর অনেক কারণ থাকতে পারে। চিন্তা চেতনার ত্রুটি তাঁর মধ্যে অন্যতম। আজকাল রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইসলামের কথা শুনলে তাঁর প্রতিক্রিয়ায় বিশেষ মহল যেমন আপন চিত্তের প্রতিক্রিয়াশীলতা অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়ার

www.pathagar.com

জন্য অস্থির হয়ে ওঠেন, কবি নজরুলের ক্ষেত্রেও দেখি আক্রমণের সেই দুর্বল প্রয়াস। প্রবন্ধকার হয়তো ভেবেছেন, নজরুল যেহেতু ইসলামকে নিয়ে কবিতা লিখেছেন, অতএব তার উপর প্রতিক্রিয়াশীলতার লেবেল লাগাতে পারলে কিস্তি খতম। কিন্তু আপাত প্রলুব্ধকর এই প্রয়াস যে কালের বিচারে টিকবে না, এইটুকু চিন্তা করার স্থিরতাও বুঝি প্রবন্ধকার হারিয়ে বসেছেন। ইসলাম যে প্রতিক্রিয়াশীল কোন ব্যাপার নয়, ইসলামের মর্মবাণী যে বিশ্বব্যাপক ও শাশ্বত—এ বোধ প্রবন্ধকারের না হলেও বিশ্ববাসীর হতে চলেছে। বিভিন্ন ইজমের ব্যর্থতার পর, বিভিন্ন খণ্ডিত দর্শনের চর্চার পর বিদগ্ধজন বুঝতে শিখেছেন, জীবন ও জগত সম্পর্কে ইসলামের অখণ্ড ও ভারসাম্যপূর্ণ চেতনাই মানুষের জন্য সর্বাধুনিক জীবন দর্শন। জ্ঞানপিপাসু মুক্ত মনের মানুষের কাছে ইসলাম নয় বরং বিভিন্ন খণ্ডিত জীবন দর্শনই এখন প্রতিক্রিয়াশীল বিষয়। কলকাতার চলতি বই মেলায় ইসলামী গ্রন্থরাজির প্রতি সেখানকার মানুষের প্রবল আগ্রহই তার প্রমাণ।

ইসলামের মর্মবাণী উপলব্ধি করতে আমাদের মত বড় বড় ডিগ্রীধারী শিক্ষিতদের বিলম্ব হলেও ডিগ্রীবিহীন নজরুলের তেমন বিলম্ব হয়নি। তাই আমাদের অনেক আগেই ইসলামের মর্মবাণীকে তিনি কাব্যরসে সিক্ত করে বঙ্গভাষীদের উপহার দিয়েছিলেন। পাঠকবৃন্দই এখন বিচার করুন প্রতিক্রিয়াশীল কে—নজরুল না প্রবন্ধকার?

রচনাকাল : ৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৮

www.pathagar.com

মহররম ঃ মেলার পিস্তলে শাড়ী পোড়ে

আমাদের চার বছরের একমাত্র কন্যা রত্নটির কাণ্ড দেখে একটু মনক্ষুণ্ণই হলাম। এত আদর করি ওকে, আর ও কিনা ওর খালার এক আহবানেই আমাদের ছেড়ে চলে গেল খালাবাড়ী বেড়াতে। যাওয়ার সময় ও মনতো খারাপ করলোই না, এমনকি আমাদের একটু বললোও না ঃ চলো না আব্বু-আম্মু তোমরাও চলো।

প্রথমে একটু খারাপ লাগলেও পরে এই ভেবে খুশী হলাম যে, যাক এই বয়সেই বাপ-মা ছাড়াও নির্ভর করার মত আরো আপনজন পেয়ে গেছে মেয়েটি আমার। যা দিনকাল তাতে এই ভাগ্যই বা কয়জনের জোটে।

পরদিন ছিল মহররম, জাতীয় ছুটির দিন। তাই সুযোগ পেয়ে গিন্নী সমেত ছুটে চললাম মেয়েকে আনতে। গিয়ে দেখি বাসায় হুলুস্থুল কাণ্ড। শুধু আমার মেয়েই নয়, সে বাসায় এসে হাজির হয়েছে আরো কয়েক জন শিশু-অতিথি। এদের পেয়েই বোধ হয় সে বাসার শিশু সদস্যদেরও বিভিন্ন বিষয়ে উৎসাহ আরো বেড়ে গেছে। বাসার খেলাধুলার উপকরণ আর সীমাবদ্ধ পরিবেশ ওদের আর সন্তুষ্ট রাখতে পারলো না। তাই ঠিক করলো বিকেলে যাবে মেলাতে। মহররম উপলক্ষেই এই মেলার আয়োজন।

বিকেল হতেই সাজ সাজ রব পড়ে গেল। কাপড়চোপড় পরে শিশুদল রেডি। অভিভাবকদের থেকে টাকা পয়সা আদায় করতেও ওরা ভুলেনি। শিশুদলের হৈ-চৈ আর কান্নাকাটির ভয়ে নানা আশঙ্কার মধ্যেও দু'এক জন তরুণকে ওদের গাইড হিসেবে মেলাতে পাঠিয়ে অভিভাবকরা যেন নিস্তার পেলাম। আর অভিভাবকদের মনের কোণে নিরুপদ্রব একটা বৈকালিক আসরের লোভও যে চাঙ্গা ছিল না, তাই বা বলি কি করে। অতএব শিশুদলের প্রস্থানের সাথে সাথেই অভিভাবকদের আসরটা বেশ জমে উঠলো।

একথা সে কথায় সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। সময় গড়িয়ে চললো কিন্তু আলাপ যেন আর থামতে চাইলো না। হঠাৎ হৈ-চৈ ও হুস-হাস আওয়াজে

www.pathagar.com

আমরা থমকে গেলাম। বাইরে তাকিয়ে বুঝলাম, ভয়ের কোনকারণ নেই। হৈচৈ আর শোরগোল আমাদের শিশুদলেরই। ওদের কারো হাতে পিস্তল, কারো হাতে মিঠাই মণ্ডা, কারো হাতে অন্য খেলনা। কেউ বা আফসোস করে বলছে, ওহ্ বাজি আনতে তো ভুলেই গেলাম। ওদের হাবভাব দেখে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে ওরা কোন আনন্দমেলা থেকে ফিরে এসেছে। কিন্তু মহররম উপলক্ষে আনন্দমেলা? মনে এই প্রশ্ন জাগলেও নানা জনের নানা কথার তোড়ে বিষয়টি আসরে আর আসন পেল না। এদিকে শিশু-দলের আনন্দউল্লাসের ধাক্কায় অভিভাবকদের আসরটিও ঘরছাড়া হবার যোগাড়। এরই মধ্যে ঘটে গেল এক কাণ্ড। মেলা থেকে সদ্য কেনা পিস্তলের একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ এসে পড়ল আমার গিন্নীর শাড়ীর উপর। আর তাতে করে শাড়ীর খানিকটা অংশ গেল পুড়ে। সবাই উহ আহ্ করে উঠলো। কিন্তু আমার গিন্নীর মুখে হাসি। কারণ ও ওর বোনটির মেজাজ জানে। ও চায় না এর জন্য বোনের ছেলেটি ধুম বকা খাক। ছেলেটি এমনিতে বেশ ভালো। আর ও তো ইচ্ছে করে শাড়ী পোড়ায়নি। হঠাৎ করেই ঘটে গেছে কাণ্ডটা। ছেলেটির কাঁচুমাচু মুখটা দেখে আমারও বেশ খারাপ লাগলো। আমি পিঠে হাত বুলিয়ে বললাম: কিচ্ছু হয়নি, যাও খেলোগে।

ছেলেটিকে তো সান্ত্বনা দিলাম কিন্তু গিন্নীকে সান্ত্বনা দেই কি করে। কারণ আমি জানি শাড়ীটার গুরুত্ব। শাড়ীটি যে শুধু বিদেশী ভাল সিল্কের তাই নয়, এর একটা উপহার মূল্যও আছে। গিন্নীর এক ঘনিষ্ঠ বান্ধবী বিদেশ থেকে এই শাড়ীটা উপহার পাঠিয়েছে। আর শাড়ীটি ও আজকেই প্রথমবারের মত পরেছিল। অতএব মেলার পিস্তলে শুধু ওর শাড়ীটাই পোড়েনি, তার আঁচ মনেও কিছুটা লেগেছে বৈকি।

সে যাক, বিষয়টা নিয়ে আর কোন হৈ-চৈ হয়নি। রাত বাড়ার আগেই হাসি মুখে চার বছরের কন্যা সমেত আমরা বাসা অভিমুখে রওয়ানা হলাম। কিন্তু নিউমার্কেটের মোড়ে এসে আমাদের রিক্সা থমকে দাঁড়াল। সামনে বিরাট মিছিল। না, এ কোন রাজনৈতিক মিছিল নয়—মহররমের তাজিয়া মিছিল। স্ত্রী-কন্যা নিয়ে রাতের বেলা বাসায় ফেরার পথে মিছিলের বাধা পেয়ে মনে বেশ বিরক্তির সৃষ্টি হলো। নানা কর্মকাণ্ড সমেত মিছিল-টাকে আমার একটা উপদ্রব বলেই মনে হলো। আর যতটুকু জানি তাতে তো একথা স্পষ্ট করেই বলা চলে: মহররম বা কারবালার শিক্ষার সাথে

www.pathagar.com

এ মিছিলের কোন সঙ্গতি নেই। বিরক্তিকর অপেক্ষার এক পর্যায়ে মিছিল শেষ হলো। এবার শুরু হলো গাড়ীর মিছিল। এরি মধ্যে লক্ষ্য করলাম মিছিলের ওদিক থেকে কয়েকজন তরুণ রে-রে করে একটি গাড়ীর দিকে ছুটে এল। কিন্তু পরে কি হল তা আর আমার জানা হলো না। কারণ সে সময় ঐ ধৈর্য আমার ছিল না।

বাসায় এসে হাত-মুখ ধুয়ে একটু শান্ত হয়ে টিভিটা অন করতেই শুনতে পেলাম আলোচনা অনুষ্ঠানের ঘোষণা। আর সে আলোচনা মহররম উপলক্ষেই। আলোচনা শুনতে শুনতে আমার পথের তাবত ক্লান্তি আর বিরক্তির যেন বিমোক্ষণ ঘটে গেল।

মহররমকে কেন্দ্র করে আমাদের সমাজে বর্তমানে মিছিল ও মাতম সহ যে সমস্ত কুসংস্কার চালু হয়েছে, তার কথা আলোচকবৃন্দ স্পষ্ট ভাবেই উল্লেখ করলেন। তাঁরা ঐতিহাসিক তথ্য এনে আরো বললেন: কারবালার ঘটনার পর প্রথম তিন শ'বছর পর্যন্ত এ সমস্ত কুসংস্কার মুসলিম সমাজে চালু ছিল না। কিন্তু এর পর তদানীন্তন ইরাকের জনৈক রাজন্য রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য আশুরাকে শোক দিবস হিসেবে ঘোষণা করেন এবং সেদিন মুসলিম মহিলাদের মুখে কালি মেখে শোক মিছিলে যোগ দেয়ার নির্দেশ জারী করেন। এ ঘটনা নিয়ে পরে সে দেশে দাঙ্গাও সংঘটিত হয়। এ ঘটনায় শুধু যে বহু মুসলিম নিহত হয়েছে তাই নয়, এতে করে মুসলিম জনতাও হয়ে পড়ে দ্বিধা-বিভক্ত।

হাজার বছর আগে মহররমকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক স্বার্থ চিন্তার কারণে যে বিদাত চালু হয়েছিল তার জের চলছে আজো। আশুরা উপলক্ষে মুসলিম জনপদে মিছিল, মাতম, তাজিয়া, রঙ ও রক্তের যে দৃশ্য আমরা এখন অবলোকন করি, অনেকে তাকে শিয়াদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান হিসেবে অভিহিত করে থাকেন। কিন্তু শিয়া মতাবলম্বীদের বর্তমান শ্রেষ্ঠ ধর্মগুরু আয়াতুল্লাহ খোমেনীর বক্তব্যে কিন্তু তার সমর্থন পাওয়া যায় না। তিনি সাম্প্রতিক এক বিবৃতিতে প্রচলিত কুসংস্কার ত্যাগ করে মহররমের প্রকৃত শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হওয়ার জন্য অনুসারীদের প্রতি আহবান জানান।

তা হলে মহররমের কুসংস্কারাচ্ছন্ন এসব আচার অনুষ্ঠানের ভিত্তি কি? ভিত্তি অবশ্যই ইসলাম নয়। এ সমস্ত কুসংস্কার এসেছে স্বার্থপরতা, অজ্ঞা

www.pathagar.com

নতা ও অন্ধ অনুকরণ থেকে। আজ কাল তো তাজিয়া মিছিলের দৃশ্যও পরিণতি দেখে তাকে অনেক সময় ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের প্রতিমা-বিসর্জনের দৃশ্য বলে ভ্রম হয়। মহররমের সময় তো কারবালা ঘটনার মহান শহীদ হযরত হোসাইন (রাঃ)-কে নিয়ে অনেক মাতম করা হয়, কিন্তু তাঁর শাহাদাতের মূল কারণ নিয়ে তো তেমন কিছু বলা হয় না। আর আমাদের কর্মকাণ্ডেও তো তা ফুটে ওঠে না। অথচ ইতিহাসের সত্যনিষ্ঠ পাঠক মাত্রই জানেন যে, রাজত্ব, নিজ ব্যক্তিত্ব বা আপন অস্তিত্বের জন্য হযরত হোসাইন (রাঃ) যুদ্ধে অবতীর্ণ হননি। বরং রাজতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে এবং খলীফা, খিলাফত ও জনগণের রায় সম্পর্কিত ইসলামের যে শরীয়ত তার ধারা অব্যাহত রাখার জন্যই তিনি বিলিয়ে গেছেন তাঁর প্রাণ। তাই হযরত হোসাইন (রাঃ)-এর এই উদ্দেশ্য ভুলে গিয়ে আমরা যদি মাতম করে মহররম পালন করি, তা হলে কি তাঁর প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শন করা হবে? আর মূল কাজ ভুলে গিয়ে এ জাতীয় মাতম অনুষ্ঠানের সার্থকতাই বা কি? তাই বোধহয় এই সব অন্তঃসারশূন্য আচার-অনুষ্ঠানের তাণ্ডব লক্ষ্য করে কবি নজরুল লিখেছিলেনঃ ফিরে এল আজ সেই মহররম মাহিনা / ত্যাগ চাই, মর্সিয়া ক্রন্দন চাহি না।

রচনাকালঃ ৬ আগস্ট ১৯৮৭

www.pathagar.com

অবাঞ্ছিত তথ্য প্রবাহ

মালয়েশিয়ার তথ্যমন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ রহমত উন্নত দেশগুলো থেকে 'অবাঞ্ছিত তথ্য প্রবাহের' আগমণ প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার জন্য আসিয়ান ভুক্ত দেশগুলোর প্রতি সম্প্রতি আহবান জানিয়েছেন।

মালয়েশিয়ায় আসিয়ানের সংস্কৃতি ও তথ্য কমিটির ১৭তম বৈঠকের উদ্বোধনী ভাষণে জনাব রহমত বলেনঃ এতদঞ্চলের জনগণের চিন্তাধারা এবং তাদের কর্মতৎপরতার ওপর পাশ্চাত্যের প্রভাব অব্যাহত রাখার হাতিয়ার হিসেবে ঐ সব তথ্য ব্যবহৃত হয় বলেই তিনি এই আহবান জানিয়েছেন। তিনি আরো বলেন, পাশ্চাত্যের প্রাধান্য বিস্তারের বিরুদ্ধে এক যোগে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ না করলে আসিয়ানভুক্ত কোন একটি দেশেরপক্ষেই এককভাবে বিষয়টির মোকাবিলা করা সম্ভব নয়।

মালয়েশীয় তথ্যমন্ত্রী আরো বলেনঃ আসিয়ান দেশগুলোর পরস্পরের মধ্যে অনুষ্ঠান বিনিময় ব্যাপকতর করার মাধ্যমেই কেবল পাশ্চাত্যের সাহিত্য, চলচ্চিত্র, টিভি অনুষ্ঠান এবং অন্যান্য মাধ্যমে আগত অবাঞ্ছিত সাংস্কৃতিক বিষয়বস্তুর মোকাবিলা করা সম্ভব। তিনি বলেন, আসিয়ান দেশগুলোর পরস্পরের মধ্যে বিনিময়ের মতো যথেষ্ট সম্পদ রয়েছে এবং তারা নিজেদের প্রয়োজন পূরণের জন্য সব সময়ই অধিকতর উন্নত দেশগুলোর দিকে তাকিয়ে না থেকে পরস্পরের ওপর নির্ভর করতে পারে।

আসিয়ানের সংস্কৃতি ও তথ্য কমিটির বৈঠকে মালয়েশীয় তথ্যমন্ত্রী 'অবাঞ্ছিত তথ্য প্রবাহের' আগমন প্রতিরোধের যে আহবান জানিয়েছেন, তা নিয়ে আসিয়ানভুক্ত দেশগুলো কতটা ভাববেন এবং বাস্তবে এগিয়ে আসবেন তা আমরা জানি না। কিন্তু পাশ্চাত্যের অবাঞ্ছিত তথ্য প্রবাহ প্রতিরোধের কর্মকাণ্ডে আসিয়ানভুক্ত দেশ হিসেবে ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন, সিংগাপুর, থাইল্যাণ্ড এবং ব্রুনাই নামের দক্ষিণ পূর্ব এশীয় এই দেশগুলো যদি কার্যকর কোন ভূমিকা পালন করতে পারে তবে এ অঞ্চলের জনগণের কাছে তা একটি উজ্জ্বল উদাহরণ হিসেবেই বিবেচিত হবে।

www.pathagar.com

আমরা যারা বাংলাদেশী তারা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার না হলেও দক্ষিণ এশিয়ার অধিবাসী। অতএব আমাদের অবস্থান তাদের একেবারে কাছাকাছি। প্রতিবেশী মানুষ তথা তৃতীয় বিশ্বের মানুষ হিসেবে আমরাও জানি পাশ্চাত্যের অবাঞ্ছিত তথ্যপ্রবাহ আমাদের জন্য কতটা ক্ষতিকর। আসলে এই তথ্য প্রবাহ আমাদের চিন্তাধারা ও কর্ম তৎপরতায় পাশ্চাত্যের প্রভাব অব্যাহত রাখার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। জাতীয় স্বাতন্ত্র্য ও মুক্তির কাংখিত লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে আমাদের অবশ্যই এই প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু আমরা মুক্ত হতে পারছি কই? পাশ্চাত্যের অবাঞ্ছিত তথ্য প্রবাহের প্রভাব অনুভবের জন্য আমাদের কোন সুক্ষ্ম বিচারে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। এ প্রসঙ্গে পাশ্চাত্য থেকে আগত বিশেষ সাহিত্য, চলচ্চিত্র ও টিভি অনুষ্ঠানের দিকে নজর দিলেই চলবে। আর গভীরতম দুঃখের বিষয় হলো এটা যে, পাশ্চাত্যের বাঞ্ছিত তথ্য প্রবাহের চাইতে এই অবাঞ্ছিত তথ্য প্রবাহের আগমন ও প্রভাবই আমাদের সমাজে বেশী।

একটি স্বাধীন দেশের মানুষ হিসেবে 'অবাঞ্ছিত তথ্য প্রবাহ' তথা সাংস্কৃতিক আগ্রাসন প্রসঙ্গে ভাবতে গিয়ে দেখিঃ অবাঞ্ছিত তথ্য প্রবাহের রয়েছে বিচিত্রবিধ স্রোত, শুধু পাশ্চাত্য প্রবাহকে চিহ্নিত করলেই চলে না। এদিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থা আসলেই ভাববারমত। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয়, কলকাতার সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের কথা। বর্তমান হালচাল দেখে আমার তো মনে হয় পাশ্চাত্যের সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের চাইতেও কলকাতার সাংস্কৃতিক আগ্রাসনই এখন আমাদের দেশে প্রকট ও উৎকট। অর্থাৎ পাশ্চাত্যের চাইতেও কলকাতার অবাঞ্ছিত তথ্য প্রবাহই যেন এখন বেশী বেগবান।

বর্তমানে আমাদের দেশে কলকাতার যে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন লক্ষ্য করি তার রয়েছে দু'টি দিক। এর একটি হলো, কলকাতার এক শ্রেণীর বাবুর সাংস্কৃতিক প্রভুত্বের মনোভাব। আর অপরটি হলো হিনমন্যতা রোগে আক্রান্ত এদেশীয় একশ্রেণীর পরজীবী সংস্কৃতিসেবীর গোলামী মনোভাব।

আজকাল আমাদের দেশে কলকাতার আগ্রাসী নায়কদের ব্যস্ত পদচারণা লক্ষ্য করা যায় স্পষ্টভাবেই। তারা এখন গোলামী মনোভাবের এদেশীয় এজেন্টদের ঘরোয়া বৈঠকে আসেন, বোটারী বৈঠকে আসেন, আসেন প্রকাশ্য আবৃত্তি উৎসবেও। এসে তারা শুধু তাদের আগ্রাসী ব্যক্তি-

www.pathagar.com

ত্বকেই দাস মহলে প্রতিষ্ঠিত করে যাননা, দিয়ে যান নানা মন্ত্রণাও। দাসরা আগ্রাসী নায়কদের আগমন ও মন্ত্রণায় কৃতার্থ হয় যায়। বিনিময়ে তারা কলকাতার প্রভুদের কাগজে পায় কিঞ্চিৎ স্থান।

কলকাতার সাংস্কৃতিক আগ্রাসীদের উৎকট উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে ঢাকার সাম্প্রতিক এক আবৃত্তি উৎসবেও। প্রভুদের উপস্থিতিতে দাসরা সেখানে সমবেত কণ্ঠে উচ্চারণ করেছেঃ ওম শান্তি, ওম শান্তি, ওম শান্তি। আবার কখনোঃ 'নমো তৎসম ভগওরাতো অবহতো সাম্মা সমুদ্ধসম।' আর শ্রোতাদের উদ্দেশে তারা কখনও উচ্চারণ করে নমস্কার, কখনোবা শুভ সন্ধ্যা।

আগ্রাসীদের মনোভাব বুঝতে আমাদের তেমন কষ্ট হয় না, কিন্তু কষ্ট হয় সাংস্কৃতিক দাসদের বুঝতে। জানি না তারা কোন জ্ঞানে কলকাতার বাবুদের সাংস্কৃতিক প্রভু মেনে নিয়েছে। অথচ এই আগ্রাসী বাবুদের পূর্ব পুরুষ প্রমথ চৌধুরীও স্বীকার করেছেনঃ Bengali literature was born in Mohamedan age, অর্থাৎ বাংলা সাহিত্যের জন্ম হয়েছিল মুসলিম শাসনামলে। আর ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন লিখেছেনঃ 'মুসলিম সুলতানরা বাংলা সাহিত্যকে পুরোপুরি পৃষ্ঠপোষকতা করছে দেখে হিন্দু রাজন্যবর্গ এবং সংস্কৃত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা আর বাংলা ভাষার প্রতি তাদের তীব্র ঘৃণা আগের মত বহাল রাখতে পারল না।'—এই দলিলগুলো কি আগ্রাসী নায়কদের এদেশীয় এজেন্টদের জানা নেই? জানা থাকলে তারা কি করে কলকাতার বাবুদের সাংস্কৃতিক গোলামীকে স্বীকার করে নেয়? যেখানে কলকাতার বাবুরা এখন নিজেরাই হিন্দীর জোয়ারে পরাভূত।

আসলে বাংলাদেশী মুসলমানদের কলকাতার বাবুদের সাংস্কৃতিক গোলামীকে স্বীকার করে নেয়ার কোন ঐতিহাসিক বা সাংস্কৃতিক বাধ্যবাধকতা নেই। তাই গুটিকয় সাংস্কৃতিক হীনমন্যের প্রাপাগাণ্ডা ও অত্যাচার কখনোই আমাদের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না।

রচনাকালঃ ২১ এপ্রিল ১৯৮৮

www.pathagar.com

সাংস্কৃতিক চেরনোবিল

'এবার সাংস্কৃতিক চেরনোবিল'। তিন শব্দের এই শিরোনামটি নানা কারণেই আমার কাছে বেশ কৌতূহল-উদ্দীপক বলে মনে হয়েছে। এমনিতেই চেরনোবিল পারমাণবিক চুল্লি থেকে বিকিরণ এখনো বন্ধ হয়নি। চেরনোবিল পারমাণবিক শক্তি প্লান্ট থেকে অতিরিক্ত বিকিরণ অব্যাহত থাকায় খোদ সোভিয়েত ইউনিয়নেই বিভিন্ন অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে। তারা অব্যাহত বিকিরণের জন্য অপর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং বিধি নিষেধ মান্য না করার ফলে সৃষ্ট বিভিন্ন ছোট দুর্ঘটনাকে দায়ী করেছে। সম্প্রতি সোশ্যালিস্ট ইণ্ডাস্ট্রি পত্রিকা বিকিরণের সমস্যার ব্যাপারে যথাযথভাবে তৎপর না হওয়ার জন্য ইউক্রেনের দলীয় কর্মকর্তাদেরও অভিযুক্ত করেছে।

দীর্ঘদিন আগে ঘটে যাওয়া চেরনোবিল দুর্ঘটনার আতঙ্ক থেকে সংশ্লিষ্ট দেশবাসী এখনো মুক্ত হতে পারেনি। আর আমরা সবাই একথা জানি যে, চেরনোবিল দুর্ঘটনার মারাত্মক প্রতিক্রিয়া শুধু রাশিয়াতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। পার্শ্ববর্তী দেশসমূহ এমনকি আমাদের দেশেও লেগেছে সেই পারমাণবিক বিকিরণের কম্পন।

তাই 'সাংস্কৃতিক চেরনোবিলের' কথা শুনে বিষয়টির প্রতি স্বাভাবিক ভাবেই মনোযোগী হতে অনুপ্রাণিত হলাম। বিষয়টির গভীরে গিয়ে দেখলাম প্রত্যক্ষভাবে 'সাংস্কৃতিক চেরনোবিল' আমাদের উপর কোন ক্রিয়া না করলেও মা নরজাতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে আমাদের জন্যও সেখানে রয়েছে দুঃখের সংবাদ।

পাঠকদের কাছে আমি এবার বিষয়টিকে বিস্তৃতভাবে তুলে ধরতে চাই। একজন শীর্ষস্থানীয় সোভিয়েত শিক্ষাবিদ দেশের সাহিত্যিক উত্তরাধিকারের প্রতি অযত্নের জন্য কর্মকর্তাদের অভিযুক্ত করেছেন। তিনি গত ফেব্রুয়ারী মাসে এক অগ্নিকাণ্ডে ৫ লাখ বই পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়ার ঘটনাকেই 'সাংস্কৃতিক চেরনোবিল' হিসেবে বর্ণনা করেন।

www.pathagar.com

গত ১৫ই ফেব্রুয়ারীতে লেনিনগ্রাদে অবস্থিত সোভিয়েত বিজ্ঞান একাডেমীর গ্রন্থাগারে আগুন লেগে গত দুই শতাব্দী ধরে সংগৃহীত অমূল্য গ্রন্থরাজি পুড়ে যায়। উল্লেখ্য যে, 'মহামতি পিটার' ঐ সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। শিক্ষাবিদ দিমিত্রি লিখাচেভ সাপ্তাহিক মস্কো নিউজে বলেন, ১৯ ঘন্টা ধরে গ্রন্থাগারে আগুন জ্বলার ঘটনা চেরনোবিল পারমাণবিক দুর্ঘটনার তুল্য। আর এই ঘটনাটি থেকে দেশের ঐতিহ্য, উত্তরাধিকার বিশেষ করে গ্রন্থাগারগুলোর রক্ষণাবেক্ষণে কর্মকর্তাদের অযত্ন অবহেলার বিষয়টি প্রকট হয়ে ধরা পড়েছে।

সরকারী সংবাদ সংস্থা 'তাস' অগ্নিকাণ্ডের একদিন পর জানায়, গ্রন্থাগার বন্ধের পর আগুন লাগায় অত্যন্ত মূল্যবান গ্রন্থরাজি নষ্ট হয়েছে, তবে কেউ হতাহত হয়নি। কিন্তু মিঃ লিখাচেভ বলেন, অগ্নিকাণ্ডের ফলে সুবিখ্যাত উইলসমূহ এবং সেই সঙ্গে করলেণ্ডি ও রেজিউইলি বংশের নৃপতিদের সৌজন্যে প্রাপ্ত গ্রন্থরাজিও পুড়ে গেছে। তিনি আরো বলেন, আগুনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া অনেক বই পানিতে নষ্ট হয়েছে। ১৯ ঘন্টাব্যাপী অগ্নিকাণ্ডে ২৫টি হোস পাইপ দিয়ে অবিরাম পানি ছিটানো হয়। ফলে পানিতে ভিজে নষ্ট হয়েছে অন্তত ৩৬ লাখ বই। বাকী যে বইগুলো আগুন ও পানির হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে সেগুলোও পচে নষ্ট হবার আশঙ্কা রয়েছে। উল্লেখ্য যে, মিঃ লিখাচেভ ১৯৮৬ সালের নবেম্বরে সোভিয়েত ইউনিয়নের নয়া সাংস্কৃতিক ফাউণ্ডেশনের প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হন।

গ্রন্থাগারটির কর্মকর্তারা অগ্নিকাণ্ডের পরপরই জানায়, ঐ সপ্তাহেই পাঠকদের জন্য গ্রন্থাগার খুলে দেয়া হবে। আর সেই লক্ষ্যে বইয়ের ধ্বংসস্তূপ ও ছাই বুলডোজার দিয়ে সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দেয়া হয়।

মিঃ লিখাচেভ জানান, লেনিনগ্রাদের লোকজন স্বেচ্ছাসেবীর মনোভাব নিয়ে বুলডোজারের ড্রাইভারকে বুঝিয়ে নিরস্ত করে এবং ধ্বংসস্তূপের ভেতর থেকে হাতে বাছাই করে বাঁচানো সম্ভব এমন সব বই উদ্ধারে সচেষ্ট হয়। লেনিনগ্রাদের শত শত অধিবাসী প্রতিদিন ঐ কাজের জন্য গ্রন্থাগারে সমবেত হয়।

মিঃ লিখাচেভ বলেন, বেঁচে যাওয়া বইগুলোকে পচন থেকে রক্ষার জন্য বিশেষজ্ঞরা যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন। কিন্তু এ কাজে সফল হতে হলে ইউনেস্কোর সাহায্য প্রয়োজন।

www.pathagar.com

আশা করি এতক্ষণের আলোচনা থেকে পাঠকবৃন্দ 'সাংস্কৃতিক চেরনোবিল'-এর স্বরূপ বুঝতে সক্ষম হয়েছেন। সোভিয়েত সাংস্কৃতিক ফাউণ্ডেশনের সভাপতি মিঃ লিখাচেভ গ্রন্থাগারে আগুন লাগার ঘটনাটিকে সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টিকারী চেরনোবিল পারমাণবিক দুর্ঘটনার সাথে তুলনা করেছেন। এই উদাহরণ দিয়ে প্রকারান্তরে তিনি বুঝাতে চেয়েছেন, লাইব্রেরীর ধ্বংস মানে জাতিসত্তার ধ্বংস। কারণ লাইব্রেরী জাতিসত্তার ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকারকে ধারণ করে থাকে। তাই মিঃ লিখাচেভ বলেছেন, সোভিয়েত বিজ্ঞান একাডেমীর গ্রন্থাগারে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় দেশের ঐতিহ্য, উত্তরাধিকারের প্রতি উদাসীনতা এবং বিশেষ করে গ্রন্থাগারগুলোর রক্ষণাবেক্ষণে কর্মকর্তাদের অযত্ন ও অবহেলার বিষয়টি প্রকটভাবে ধরে পড়েছে।

গুরুত্বপূর্ণ এই গ্রন্থাগারটির প্রতি যে শুধু মিঃ লিখাচেভই সচেতন তা কিন্তু নয়। স্থানীয় জনগণও গ্রন্থাগার দুর্ঘটনার জন্য মর্মাহত। কিন্তু তারা তাদের মর্মযাতনাকে শুধু দুঃখ প্রকাশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেন নি। তারা সরকারী উদ্যোগের পাশাপাশি স্বেচ্ছাসেবীর মনোভাব নিয়ে ধ্বংসস্তূপের ভেতর থেকে নিজ হাতে বই উদ্ধারের প্রচেষ্টায়ও নিজেদের করেছেন নিয়োজিত।

সাধারণ জনগণের পাশাপাশি প্রাগ্রসর জনতা হিসেবে মিঃ লিখাচেভও গ্রন্থাগারের ক্ষতির পরিমাণ এবং গভীরতা যাচাইয়ে সচেষ্ট হয়েছেন। তাই তিনি বলতে পেরেছেন: বেঁচে যাওয়া বইগুলোকে পচন থেকে রক্ষার জন্য ইউনেস্কোরও সহযোগিতা প্রয়োজন।

'সাংস্কৃতিক চেরনোবিল' সম্পর্কে এতক্ষণ যে আলোকপাত করলাম তা কি একান্তভাবে রুশ দেশেই সীমাবদ্ধ? আমার তো মনে হয় বিষয়টি শুধু রুশ দেশেই সীমাবদ্ধ নয়। বিভিন্ন সময় পত্র-পত্রিকায় মুদ্রিত সংবাদগুলো জড়ো করলে দেখা যাবে, আমাদের দেশেও লাইব্রেরীতে অগ্নিকাণ্ড হয়েছে, পোকাতে বই কেটেছে, বই খোয়া গেছে, পাঠাগার অব্যবহৃত রয়েছে। আর লাইব্রেরী রক্ষণাবেক্ষণ প্রসঙ্গ? এই ব্যাপারটি যে তেমন আশাব্যঞ্জক নয়, তা বোধ হয় না বললেও চলে। বলা চলে 'সাংস্কৃতিক চেরনোবিল'-এর উদ্ভব আমাদের দেশে রুশ দেশেরও আগে হয়েছে। অথচ এ ব্যাপারে আমরা সবাই কেমন যেন নীরব। সব দেখে-শুনে মনে হয়, জাতীয় অগ্রগতিতে যেন লাইব্রেরীর তেমন কোন গুরুত্বই নেই।

www.pathagar.com

অবশ্য এ প্রশ্ন নিয়ে কারো মুখোমুখি হলে তখন দেখা যাবে ভিন্ন চিত্র। তখন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি লাইব্রেরীর গুরুত্বকে দারুণভাবে স্বীকার করে নিয়ে এর অনগ্রসরতার জন্য বিভিন্ন কারণকে দায়ী করে বসবেন। কিন্তু লেনিনগ্রাদের সোভিয়েত বিজ্ঞান একাডেমী গ্রন্থাগারের অগ্নিকাণ্ড থেকে আমরা জানলাম, জাতিসত্তার ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার সম্পর্কে উদাসীনতাই গ্রন্থাগার বিনাশের মূল কারণ। আর এর সাথে তাৎক্ষনিক বিভিন্ন কারণ তো জড়িত থাকবেই। লাইব্রেরীকে তার মর্যাদায় ফিরিয়ে নেবার পদ্ধতিও আলোচ্য ঘটনায় বিদ্যমান। আর তা হলো, সরকারী ও কর্তৃপক্ষীয় উদ্যোগের পাশাপাশি জনগণের মধ্যেও থাকতে হবে স্বেচ্ছাসেবীর মনোভাব। এ প্রসঙ্গে প্রাগ্রসর জনগণ তথা জ্ঞানী ব্যক্তিদের অগ্রণী ভূমিকা পালনের বিষয়টিও স্মরণযোগ্য।

লাইব্রেরী প্রসঙ্গে পরিশেষে শিক্ষিত মহলের কাছে একটি প্রশ্ন রাখতে চাই: শিক্ষিত মানুষ হিসেবে আমাদের কতজনের ব্যক্তিগত বা পারিবারিক লাইব্রেরী আছে, আর লাইব্রেরীর চর্চাই বা আমরা করি কতটুকু? ব্যক্তি-পর্যায়ে লাইব্রেরীর গুরুত্ব চিহ্নিত না হলে জাতীয় পর্যায়ে তার কাংখিত গুরুত্ব কতটা নিশ্চিত করা যাবে? আমার মনে হয়, আপন স্বার্থেই বিষয়টি নিয়ে সবার ভাবা দরকার।

রচনাকাল: ৭ এপ্রিল ১৯৮৮

www.pathagar.com

শব্দ পীড়ন

সম্প্রতি ঢাকায় মনোবিজ্ঞানীদের একটি সম্মেলন হয়ে গেল। সম্মেলনে বলা হয়, মানুষের স্নায়ুতন্ত্রের ওপর বর্তমানে শব্দপীড়ন স্বাভাবিক সহন সীমার ১০০ ভাগ বেশী পড়ছে। এর কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে গবেষকরা বলেনঃ সামাজিক অবস্থান দৃঢ় করার আন্তঃপ্রতিযোগিতা, উচ্চাভিলাষ-জনিত তৎপরতায় সৃষ্ট টেনশন, প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির মেরুদূর অবস্থান, সন্তানের জন্য দুশ্চিন্তা, সড়ক দুর্ঘটনার সার্বক্ষণিক ভয়, অর্থনৈতিক উদ্বেগ, লোকসংখ্যার প্রচণ্ড চাপ, যান্ত্রিক যানবাহনের অসহনীয় শব্দ ইত্যাদির ফলে পরিবেশের কোলাহলজনিত অত্যধিক সাউণ্ড ইফেকট বাংলাদেশে মানুষের সহনসীমার ১০০ ভাগ বেশী কার্যকর রয়েছে।

গবেষকরা আরো বলেনঃ পরিবেশগত কারণে যে বিরক্তিকর শব্দের সৃষ্টি হয় তা যে শুধু স্নায়ুতন্ত্রের জন্যই ক্ষতিকর তা নয়, মানুষের মেধা ও মননের ওপরও তা প্রচণ্ডভাবে আঘাত হানে। মানুষের সৃষ্টিশীল প্রতিভা নষ্ট কিংবা বিকাশ রোধ করার ক্ষেত্রেও প্রতিবেশগত শব্দপীড়নকে চিকিৎসা বিদ ও মনোবিজ্ঞানীরা দায়ী করেছেন। স্বাভাবিক ক্ষেত্রে মানুষের কোলাহলজনিত শব্দ সহ্য করার ক্ষমতা ৫০ থেকে ৬০ ডিসিবল (শব্দ পরিমাপক ইউনিট)। কিন্তু বর্তমানে আমাদের জনগণ তার ১০০ ভাগ বেশী শব্দ পীড়নে আক্রান্ত হচ্ছে।

বর্তমানে জনসংখ্যার হার দ্রুতবৃদ্ধির কারণে হৈ চৈ, চিৎকার, সামাজিক অস্থিতিশীলতার জন্য বোমাবাজি, গণ্ডগোল, রাস্তাঘাটে যানবাহনের অস্বাভাবিক ও বিকট হর্ন, দুর্দশাগ্রস্ত ইঞ্জিনসমূহের যন্ত্রণাদায়ক চিৎকারের মুখোমুখি তো আমরা অহরহই হচ্ছি। আর এই সব বিচিত্রবিধ চিৎকার, গণ্ডগোল ও আওয়াজসমূহই বর্তমানে বাংলাদেশে উৎপন্ন করছে ১০০ থেকে ১১০ ডিসিবল শব্দ। এ সব শব্দপীড়ন থেকে হাসপাতাল, স্কুল, মসজিদ কিছুই রেহাই পাচ্ছে না। ফলে হাসপাতালে কষ্ট বাড়ে রুগীর, বিদ্যালয়ে ব্যাঘাত ঘটে লেখা পড়ায় আর মসজিদে ধ্যান ভাঙ্গে উপাসনাকারীর।

www.pathagar.com

গবেষকদের বক্তব্য থেকে জানা যায়ঃ ক্রমাগতভাবে শব্দপীড়নের ব্যাপক ক্ষতিকারক প্রতিক্রিয়া মানসিক ও শারীরিক উপাদানের উপর ক্রিয়া করে মানসিক স্বাভাবিক প্রক্রিয়া ও ভারসাম্যে পরিবর্তন আনছে। এই কারণে সমাজে নতুন বিপর্যয় সৃষ্টির আশংকা রয়েছে বলেও গবেষকরা মত প্রকাশ করেন। এই প্রেক্ষাপটে মনোবিজ্ঞানীরা নগরায়ন, শিশু প্রবন্ধ নির্মাণ, শ্রমিক এলাকার সুপরিকল্পিত বিন্যাস, ভাসমান মানুষের বসবাসের ব্যবস্থা, বস্তি নির্মাণ, যানবাহন চলাচলে যথাযথ নিয়মনীতি প্রণয়ন, যান-বাহনের সমস্যা দূরীকরণ, চালকদের আচরণ অধ্যয়ন করে তাদের উগ্র মনমানসিকতা পরিবর্তন এবং জনসচেতনতা সৃষ্টির সুপারিশ করেন। এছাড়া মনোবিজ্ঞানীরা শিক্ষা, গবেষণা, শান্তিপূর্ণ বসবাস, বিশ্রামসহ ভার সাম্যপূর্ণ প্রতিবেশ গড়ে তোলার প্রয়োজনে দেশে শব্দপীড়নের মাত্রা স্বাভাবিক সীমার মধ্যে আনার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

মনোবিজ্ঞানীদের এই যে অভিমত এবং সুপারিশ তা সরকার এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা কতটুকু বাস্তবায়ন করবেন জানি না। তবে সুপারিশগুলো বাস্তবায়িত হলে জনগণ যে উপকৃত হবে সে কথা বোধ হয় ভুক্তভোগী মাত্রই স্বীকার করবেন।

শব্দ-পীড়নের কথা ভাবতে গিয়ে গবেষকদের কথাগুলোর পাশাপাশি আমার আরো একটি প্রসঙ্গ মনে পড়লো। গবেষকরা তো শব্দ পীড়ন প্রসঙ্গে সাউণ্ড ইফেক্টের কথা বলেছেন। কিন্তু আমার মনে হয় শব্দ শুধু সাউণ্ড বহন করে না, সে একটা মর্ম ও ধারণ করে। তাই মানবিক ও যান্ত্রিক উচ্চারণে ধ্বনিগত পীড়নের সাথে সাথে মর্ম বা অর্থগত পীড়নের প্রসঙ্গও এসে পড়ে।

আজকাল আমরা বিনোদন মাধ্যমে যে গান শুনি, কথোপকথনে যা শ্রবণ করি অথবা নিজেরা যা উচ্চারণ করি তাই বা কতটুকু স্বাস্থ্যপ্রদ। আমাদের উচ্চারিত ও শ্রবিত ধ্বনি সমূহ 'সাউণ্ড ইফেক্ট' ও 'মিনিং ইফেকট' এর দিক থেকে কতটুকু পীড়নমুক্ত? কোন উৎকট বিষয় মৃদু কণ্ঠে উচ্চারিত হলে হয়তো সাউণ্ড ইফেক্টের দিক থেকে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবো না কিন্তু মিনিং-ইফেকটের দিক থেকে যে আমরা পীড়িত হবো তা বোধ হয় না বললেও চলে। তাই আমাদের সমাজকে পীড়ন থেকে পরিপূর্ণভাবে মুক্ত করতে চাইলে আমাদের ধ্বনিগত ও মর্মগত এই উভয় বিষয়েই

www.pathagar.com

সতর্ক হতে হবে। অর্থাৎ আমরা কি উচ্চারণ করবো এবং কিভাবে উচ্চারণ করবো এই দুটি বিষয়কেই আমাদের বিবেচনায় আনতে হবে। বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করে আমরা বলতে পারিঃ শব্দ পীড়নের আসলে দুটি দিক রয়েছে, এর একটি ধ্বনিগত এবং অপরটি নীতিগত। এ প্রসংগে আমরা হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর একটি ঘটনা উল্লেখ করতে পারি। একদিন হযরত উমর (রাঃ)হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর কাছে যান। সেখানে তিনি দেখতে পান, হযরত আবুবকর (রাঃ) নিজ জিহবা হাত দিয়ে ধরে টানছেন। তখন হযরত উমর (রাঃ) বলেন, 'আপনি একি করছেন? আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন।' হযরত আবুবকর (রাঃ) তখন বলেন, 'এই জিভ আমাকে ধ্বংস করে দিয়েছে।'

হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর উদাহরণ থেকে বোঝা যায় ধ্বনিগত নয়, মর্মগত কারণেই তিনি জিভকে শাস্তি দিতে চেয়েছিলেন। আসলেই প্রাত্যহিক জীবনে আমাদের জিভ নানা ধরনের ভ্রান্ত কাজে লিপ্ত হতে পারে। কখনো সে লিপ্ত হতে পারে বিকট শব্দ উৎপাদনে কখনো বা লিপ্ত হতে পারে গীবত, চোগলখোরী ও মিথ্যা ভাষণের মত হীন কাজে। ধ্বনিগত ও মর্মগত এই উভয় পথেই সে আমাদের করতে পারে পীড়িত। মানুষ হিসেবে এই পীড়নের কাজ থেকে আমরা যদি নিজেদের মুক্ত করতে পারি তাহলে অন্যান্য পীড়ন যন্ত্রগুলোর হাত থেকেও আমরা পেতে পারি রেহাই। কারণ সব পীড়নের পিছনেই তো মানুষ থাকে ক্রিয়াশীল। শব্দ পীড়নের বিষয়টিকে এ দৃষ্টি ভঙ্গিতে দেখলেই বোধ হয় আমরা অধিকতর কল্যাণ লাভে সক্ষম হবো।

রচনাকালঃ ২৪ মার্চ ১৯৮৮

www.pathagar.com

পরাশক্তির দুঃখ

আমরা শুধু পরাশক্তির বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে থাকি কিন্তু পরাশক্তিরও যে দুঃখ থাকতে পারে তা কি কখনো ভেবে দেখেছি? পরাশক্তির তো অনেক কাজ। নিজ দেশ ও জনগণকে শাসনে রাখা, ভিন দেশকে বলয়ে রাখা। বিশ্বশান্তির প্রয়োজনে কখনো কখনো অপর দেশে হস্তক্ষেপ করা। বিশ্বের অর্থনীতি, সমরনীতি ও রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণে রাখা। এরপরও পরাশক্তিকে আপন ইমেজ বজায় রাখার জন্য জড়িয়ে পড়তে হয় বিচিত্রবিধ আরো কত কর্মকাণ্ডে। সে হিসেব কি আমরা রাখি? এত হিসেব রাখার যোগ্যতাই বা কোথায় আমাদের! পারি শুধু পরাশক্তির দোষ ঘাঁটতে।

সেই কবে বিশ্ব রাজনীতির স্বার্থে আমেরিকা একবার ভিয়েতনামে নেমেছিল, সে কথা আমরা এখনো মনে রেখে দিয়েছি। চেকোশ্লোভাকিয়ায় কোন দিন রুশ ট্যাঙ্ক একটু পদচারণা করেছিল সে কথাও আমরা ভুলতে পারিনি। আর হালে ফিলিস্তিন, লেবানন, মধ্যপ্রাচ্য, কাম্পুচিয়া, নিকারাগুয়া, আফ্রিকা এবং আফগানিস্তানকে ঘিরে পরাশক্তির যে তৎপরতা, তাকে আমরা শুধু একচোখে দেখছি। আমরা শুধু এসব দেশের জনগণের স্বার্থের কথা ভেবেই কথা বলছি। কিন্তু আমরা কি কখনো পরাশক্তির বিশ্বতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে সমস্যাগুলোর বিচার-বিশ্লেষণ করতে পেরেছি? আমরা তো ছোট ছোট দেশগুলোকে নিয়ে কেবল ছোট ছোট চিন্তায় মগ্ন। বিশ্ব-রাজনীতি, বিশ্ব-ভারসাম্য ইত্যাদি নিয়ে চিন্তা ভাবনা করার মগজই বা কোথায় আমাদের! আর উন্নত মগজের জন্য তো উন্নত খাবার-দাবারেরও প্রয়োজন হয়, প্রয়োজন হয় পুষ্টির। যেখানে ক্ষুধায় অন্ন জোটে না সেখানে আবার পুষ্টি চিন্তা! তাই ভেবে দেখেছি আমাদেরও বোধ হয় তেমন কোন দোষ নেই। আর ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে তো ওসব চিন্তা মানায়ও না।

মস্তিষ্ক না হয় না-ই থাকলো, কিন্তু হৃদয় বলে কি কিছু নেই আমাদের? সেই হৃদয় দিয়েতো পরাশক্তির দুঃখগুলো একটু বোঝা যেতে পারে।

এই যে রুশ দেশ—বিশ্বশান্তি, বিশ্বমৈত্রীর জন্য উদয়াস্ত তার কি বিপুল তৎপরতা—সমর অভিযাত্রা কিংবা প্রচার প্রপাগাণ্ডা, কোন কিছুতে কি তার

www.pathagar.com

কোন কমতি আছে? অথচ তার এই আন্তর্জাতিক অভিপ্রায়ের মূলে কুঠারাঘাত করছে আজ তার আপন দেশের লোকজনই। আর এ জন্য আজ বিশ্বে তার ইমেজও হচ্ছে দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। এ কি পরাশক্তির কম দুঃখ? অথচ আমরা তা বুঝতে চাই না।

রাশিয়া আপন দেশে যে সমাজতান্ত্রিক স্বর্গ নির্মাণ করেছে, বহির্বিশ্বকে সে তা জানাতে চায়। আর আমরাও তাদের বই-পুস্তক, পত্র পত্রিকা ও প্রপাগাণ্ডার মাধ্যমে তা জেনে আসছি। এবং কমরেডদের স্বর্গরচনার মহৎ কর্মের চিত্র দর্শনে আমরা অনেকে অনুপ্রাণিতও হচ্ছি। অথচ এমন দেশের মুখেই কিনা কালিমা লেপন করলো স্বদেশের বিশাল বিশাল কমরেডগণ। তাদের কর্মকাণ্ডের ফিরিস্তি প্রকাশিত হবার পর রাশিয়া কি করে তার কমরেড-ইমেজ টিকিয়ে রাখবে। সমাজতান্ত্রিক কমরেডরা যে সামান্য বস্তুগত স্বার্থের কারণে পুঁজিবাদী আমলাদের মত ভ্রষ্ট হয়ে গেল, এ কি পরাশক্তির কম দুঃখ!

ব্রেজনেভ। ব্রেজনেভ তো আর ইহজগতে নেই। কিন্তু তার জামাতা, এককালের উপ-স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ইউরিচুরবানভ এ কি করলো! কমরেডদের সেই দৃঢ় শপথ, সমাজতান্ত্রিক ব্যক্তিত্ব সব কিছু বিসর্জন দিয়ে অবশেষে সে কিনা ঘুষ খেয়ে বসলো। আর তাও মাত্র ৬ লাখ ৫০ হাজার রুবল! কমরেডরা শুধু ঘুষ খাওয়ার মধ্যে নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখলে হয়তো রাশিয়ার দুঃখ তেমন বাড়তো না। আত্মসাতের ঘটনায়ও যে তারা পুঁজিবাদী আমলাদের হার মানাতে বসেছে। উজবেকিস্তানের একটি সুতাকল থেকেই তারা কোটি কোটি রুবল আত্মসাত করে বসেছে। কমরেডদের এহেন অপকর্ম কি করে সহ্য করবে রাশিয়া? তাই ইতিমধ্যে ৩ জনকে দিয়েছে মৃত্যুদণ্ড। এই আত্মসাতের ঘটনার সাথে জড়িত ছিলেন উজবেকিস্তানের কম্যুনিষ্ট পার্টি প্রধানও। কিন্তু ঘটনা ধরা পড়ার আগেই তিনি মারা গিয়েছিলেন। কিন্তু মারা গেলে কি হবে, রুশ প্রশাসন কি তাঁকে ছাড়তে পারে? তাই দুর্নীতির দায়ে মরণের পর তাঁর সব সরকারী খেতাব প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। জানি না দুর্নীতিগ্রস্ত আরো কত কমরেডের খেতাব ও ম্যাডেল রুশ প্রশাসনকে দুঃখভরা হৃদয়ে প্রত্যাহার করে নিতে হবে।

এসব দৃশ্য দেখে কমরেডদের স্বর্গরাজ্য সম্পর্কে আমাদের মোহমুক্তি ঘটেছে কিনা জানি না। কিন্তু ক্ষমতা ও সম্পদের লালসামুক্ত কোন কোন

www.pathagar.com

রুশ অঞ্চলের কিশোর ও তরুণদের মধ্যে মোহমুক্তির চেতনা সঞ্চারিত হতে দেখা যাচ্ছে। তারা বুঝতে শিখেছে আল্লাহ খোদাকে বাদ দিয়ে, পর কালের জবাবদিহিকে তোয়াক্কা না করে আর যাই হোক, পৃথবীকে কোন স্বর্গরাজ্য উপহার দেয়া যায় না। তাই রাশিয়ার তাজাকিস্তানে আজ নাস্তিক-কতার বড় দুর্দিন। তাজাকিস্তান কম্যুনিষ্ট পার্টির ফার্স্ট সেক্রেটারী মিঃ মাখকামভকেও আন্তর্জাতিকতাবাদ ও নাস্তিকতাবাদ শিক্ষা দানের ব্যাপারে কম্যুনিস্টদের ব্যর্থতার দরুন অসন্তোষ প্রকাশ করতে দেখা যায়।

উল্লেখ্য যে, সম্প্রতি তাজাকিস্তানের মাধ্যমিক স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে একটি ছাপানো ফরম বিলি করে তা পূরণের জন্য বলা হয়। উক্ত ফরমের একটি প্রশ্নে ধর্ম সম্পর্কে ছাত্রদের মতামত জানতে চাওয়া হয়। এই প্রশ্নের জবাবে প্রায় সব ছাত্রই একই ধরনের মনোভাব ব্যক্ত করে। তারা লিখিতভাবে জানায়ঃ "ধর্মের ব্যাপারে আমার দৃষ্টিভংগী সক্রিয়"; "আমি আল্লাহ্‌তে বিশ্বাসী", "আল্লাহর অস্তিত্বে আমি বিশ্বাস করি।"

সরকারী সমীক্ষকবৃন্দ অনুসন্ধানে জানেন যে, তাজাকিস্তানের অনেক স্কুলেই কম্যুনিষ্ট পার্টি কর্তৃক সম্প্রসারিত নাস্তিকতাবাদ অধ্যয়নের জন্য তরুণদের কোন 'স্টাডি গ্রুপের' অস্তিত্ব নেই। অনেক স্কুলে ছাত্রদের ইস-লামী শরাশরিয়ত সম্পর্কে রীতিমত সবক দেয়া হয়। অবশ্য তা দেয়া হয় খুব গোপনভাবেই। কারণ ফাঁস হয়ে গেলে তাতে শাস্তির ভয় আছে। কোন কোন স্কুলে শিক্ষকদের নিষ্ক্রিয়তার ছদ্মাবরণে ইসলাম সম্পর্কে শিক্ষাদান চলছে।

সমীক্ষায় আরো বলা হয়, তাজাকিস্তানের শিক্ষার্থীরা ব্যাপকভাবে রোযা পালন করে থাকে। একটি স্কুলে 'কমসোমলের' (তরুণ কম্যুনিষ্ট) পুরা ৮ জন সদস্যই রমযান মাসে রোযা রাখে। আর একটি স্কুলের প্রতি শ্রেণীতেই ১০ হতে ১৫ জন ছাত্রকে রোযা রাখতে দেখা যায়। এদের অনেকেই 'কম-সোমলের' সদস্য। পর্যাপ্ত সংখ্যক ছাত্র রোযা শুরু হওয়ার পর স্কুলেও আসে না। তাজাকিস্তান প্রজাতন্ত্রের বিভিন্ন স্থানে এমনকি রাজধানীতেও 'অবৈধ স্কুলের' সন্ধান পাওয়া গেছে। এসব 'স্কুলে' ছাত্রদের 'ইসলামী শিক্ষা' দেয়া হয়। জুমার নামাযের সময় স্কুল ছাত্রদের ব্যাপক হারে মসজিদে সমবেত হতে দেখা যায়। অনেক শিক্ষকও নিয়মিতভাবে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করে থাকেন। তাই সমীক্ষায় অভিযোগ করা হয়, এভাবেই

www.pathagar.com

তারা ছাত্রদের সামনে নিকৃষ্ট নজির স্থাপন করে চলছেন।

তাই বলছিলাম, পরাশক্তিরও দুঃখ আছে। স্বদেশে রুশ কমরেডরা ঘুষ ও আত্মসাতের ঘটনার মাধ্যমে কমিউনিস্ট চরিত্রের ইমেজ নষ্ট করছেন। অপরদিকে আন্তর্জাতিক কর্মকাণ্ডের স্বার্থে আফগান হয়ে সাগরে নামবে তাতেও বাধ সেধে বসে আছে মুজাহিদরা। এখন তো দেখা যাচ্ছে আফগানিস্তান 'রাশিয়ার ভিয়েতনাম' হতে চলেছে। এদিকে আবার রুশ দেশের মাটিতেই চলছে 'বৈরী আদর্শের' উত্থান। তরুণরা এখন কম্যুনিজমের বদলে উল্টো ইসলামের প্রপাগাণ্ডাতেই উৎসাহ বোধ করছে। এমন কি 'কমসোমলরা' (তরুণ কম্যুনিস্ট) পর্যন্ত।

এত কিছুর পরও কি রাশিয়ার দুঃখ পেতে নেই? তাই বলছিলামঃ আমরা শুধু পরাশক্তির বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে থাকি, কিন্তু পরাশক্তিরও যে দুঃখ থাকতে পারে, তা কি কখনো ভেবে দেখেছি?

রচনাকালঃ ২৮ জানুয়ারী ১৯৮৮

www.pathagar.com

ট্র্যাজেডির নানা কথা

আত্মহত্যা পাপ। আর আত্মহত্যার প্রক্রিয়াটাও সুখকর কিছু নয়। এ কথা জেনেও মানুষ তবু দুঃখময় আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। কিন্তু কেন? এই কেন'র একক কোন জবাব আমার জানা নেই। তবে এটা জানি সব আত্মহত্যার কারণ এক নয়। আর সব আত্মহত্যার ঘটনাও আমাদের এক রকম করে ভাবায় না। তাই আত্মহত্যার প্রতিক্রিয়ায়ও লক্ষ্য করা যায় তারতম্য। কোন কোন আত্মহত্যার ঘটনায় সমবেদনার পরিবর্তে মানুষকে বিরক্ত হতেও দেখা যায়। আবার কোন কোন আত্মহত্যার ঘটনায় মানুষের হৃদয় ভেঙ্গে যায়। মানুষের অনুতপ্ত মন বলে ওঠে ঃ এ আত্মহত্যার দায়দায়িত্ব কিছুটা আমাদের ঘাড়েও বর্তায়।

আসলেই কোন কোন আত্মহত্যা সমাজের প্রতি রাষ্ট্রের প্রতি প্রশ্ন রেখে যায়। সম্প্রতি এমনি একটি আত্মহত্যার খবর আমাদের গোচরীভূত হয়েছে। আত্মহত্যার এই ঘটনাটি ঘটেছে পাকিস্তানের থর মরু অঞ্চলে। এই থর মরু অঞ্চলে গত বছর কমপক্ষে ৩৫০ জন মা চরম হতাশায় শুকিয়ে যাওয়া কূপের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাণ দিয়েছেন। এই হতভাগিনী মায়েরা তাদের শিশুদের ক্ষুধায় অন্ন, তৃষ্ণায় পানি দিতে না পেরে আত্মাহুতির এই মর্মান্তিক পথ বেছে নিয়েছেন।

উপর্যুপরি সাতটি বছর ধরে থর মরু অঞ্চলে খরা চলছে। গত চার বছরে একটি ফোঁটা বৃষ্টিও সেখানে পড়েনি। পাকিস্তানের থর মরু অঞ্চলে প্রায় ১০ লাখ লোক বাস করে। এদের অধিকাংশই যাযাবর শ্রেণীর। পশুচারণ তাদের একমাত্র জীবিকা। কিন্তু বৃষ্টিহীন গত চারটি বছরে মরু তৃণ, লতাপাতা, আগাছা সব মরে গেছে। গত ক'বছর ধরে থর মরু অঞ্চলের মানুষ মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ তাদের এই ভয়াবহ ট্র্যাজেডির আভাস পেয়েছে মাত্র ক'সপ্তাহ আগে।

পাকিস্তানের এই মরুভূমি ভারতের রাজস্থানের থর মরু ভূমিরই অংশ যা বর্তমানে সিন্ধু প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত। ভারত সীমান্ত সংলগ্ন মরু

www.pathagar.com

অঞ্চলের রিপোর্ট সাধারণভাবে আসতে পারেনা সরকারী সেন্সরশীপ ছাড়া। আর পাকিস্তানের আমলারা ঐ অঞ্চলের যে কোন রিপোর্টকেই সামরিক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন।

থর মরু অঞ্চলের মায়েরা বছরের পর বছর খরার দাবদাহ সইতে পারলেও নিরন্ন ও তৃষ্ণার্ত শিশু সন্তানদের শুষ্ক মুখের করুণ দৃশ্যের ভার আর বইতে পারলো না। জীবন যুদ্ধে পারাভূত হয়ে তারা আত্মাহুতির পথ বেছে নিল। তাদের আত্মাহুতির এই সিদ্ধান্ত নিয়ে আমাদের অনেকের মনেই তর্ক থাকলেও নিরন্ন ও তৃষ্ণার্ত এইসব দুঃস্থ মানুষদের ব্যাপারে সে দেশের সরকার যে সঠিক দায়িত্ব পালন করেনি সে সম্পর্কে বোধ হয় কারো মনে কোন বিতর্ক নেই। আর সে দেশের জনগণ? জনগণ তো এই মর্মান্তিক খবর জানতেই পারেনি। তাদের অবগতির অধিকার থেকে বঞ্চিত রেখেছে সামরিক প্রশ্ন। অবশ্য এখন তারা থর মরু অঞ্চলের দুঃস্থ মানুষদের দুঃখ-কথা জানতে পেরেছে। আশা করি এখন তারা তাদের যোগ্য ভূমিকা পালনে এগিয়ে আসবেন। আর জনতা জাগলে সরকারেরও যে টনক নড়বে তা অভিজ্ঞতার আলোকে স্পষ্ট করেই বলা যায়।

এতক্ষণ তো আমরা থর মরু অঞ্চলের ট্র্যাজেডির কথা শুনলাম। কিন্তু আমাদের দেশের মানুষদের নিয়েও যে ভিন্ন মানচিত্রে আর এক ট্র্যাজেডি রচিত হয়েছে সে খবর আমরা ক'জনা জানি। অবশ্য সে ট্র্যাজেডির কারণ খরা নয়, কিংবা নয় ক্ষুধাতৃষ্ণার স্থূল জ্বালা। সে ট্র্যাজেডির কারণ ভিন্ন রকম। আর পাক-জনগণের মত আমরাও এ ট্র্যাজেডির খবর জেনেছি বিলম্বে এবং একটি সুইডিশ পত্রিকার কল্যাণে।

এবার আমাদের দেশের নাগরিকদের ট্র্যাজেডির ঘটনায় আসা যাক। তিন বছর ধরে সুইডেনে অবস্থান করছে পাঁচজন বাংলাদেশী যুবক। কিন্তু এতদিন সুইডেনে অবস্থান করেও তারা সে দেশের ইমিগ্রেন্ট হতে না পারায় এবং এজন্য দেশে প্রত্যাবর্তন করতে হবে বিধায় তারা আত্মহত্যার চেষ্টা করে। ধারালো ছুরি দিয়ে ঐ যুবকরা তাদের নিজেদের শরীর ক্ষত বিক্ষত করে এবং ঘুমের ট্যাবলেট খেয়ে এরা ঘরে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। এই সংবাদ পেয়ে সুইডিশ পুলিশ যুবকদের উদ্ধার করে। এ খবর সুইডেনের একটি জাতীয় দৈনিক প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটিতে আরো মন্তব্য করা হয় যে, তিন বছর সুইডেনে অবস্থানের পর এদের দেশে পাঠিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত

www.pathagar.com

নেয়া সরকার ও ইমিগ্রেশন বিভাগের ঠিক হয়নি। বাংলাদেশী এই পাঁচ যুবকের এখন মানসিক হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে।

যুবকদেরতো মানসিক হাসপাতালে ভর্তি করা হলো, জানিনা সে চিকিৎসায় তারা কতটুকু সুস্থ হয়ে উঠবে। তবে আমার মনে হয়, শুধু যুবকদের চিকিৎসাতেই বিষয়টির সুরাহা হবে না। কারণ যুবকদের আত্মহত্যার সে প্রচেষ্টায় শুধু যুবকরাই নয়, অন্যান্য আরো পক্ষ জড়িত রয়েছেন। এ প্রসঙ্গে সমাজ, সরকার ও অভিভাবকদের কথা উল্লেখ করতে হয়।

যে যুবকরা সুইডেনে আত্মহত্যা করতে চেয়েছিল, তারা দেশে ফিরতে চায় না। এ দেশ, এ সমাজ তাদের কাছে আর ভাল লাগছে না। প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার প্রতি অনীহা প্রকাশ ও আপাতঃ মুক্তির আশায় তারা পাড়ি জমিয়েছে বিদেশে। আমরা জানি এ ধরনের যুবকদের সংখ্যা পাঁচজনে সীমিত নেই। যুবকদের এ সংখ্যা অনেক এবং ক্রমবর্ধমান। আপন দেশ ও সমাজ সম্পর্কে হতাশ যুবকদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যা নিশ্চয় দেশ ও জাতির জন্য কল্যাণকর নয়। কিন্তু হতাশাবাদের পরিবর্তে যুবকদের মধ্যে আশাবাদ জাগ্রত করার দায়িত্ব কি সরকার পালন করছেন? দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার অবস্থা, কর্মসংস্থানের চিত্র, অর্থনৈতিক ও নৈতিক মেরুদণ্ড—এর কোনটি আমাদের জন্য আশাব্যঞ্জক? আর এ অবস্থায় অভিভাবকরাই বা কি দায়িত্ব পালন করছেন? সন্তানদের শুধু গায়ে-গতরে বড় করে তোলার মধ্যেই তো অভিভাবকদের দায়িত্ব পালন সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। জীবন ও জগৎ সম্পর্কে সন্তানদের সঠিক ধারণা দেওয়াও তো অভিভাবকদের দায়িত্ব। আর জীবন মানেই যে বড় বড় ডিগ্রী ও বিত্তের সমষ্টি নয়, সে বোধও তো সন্তানদের থাকা দরকার। কিন্তু আমাদের আচরণে সে শিক্ষা সন্তানরা পায় কি?

পরিশেষে আত্মহত্যায় প্রলুব্ধ যুবকদের কাছে আমাদের প্রশ্ন: বাংলাদেশে আপনাদের মত অসংখ্য শিক্ষিত যুবক কি বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে জীবন সংগ্রামে টিকে নেই? তারা তো দেশের সুখ-দুঃখের অংশীদার হয়ে নিজের মত বেঁচে আছে। তাহলে আপনারা পারবেন না কেন? বিদেশে সম্মানের সাথে বাঁচতে না পারলে তবে আর কিসের মোহে দেশত্যাগ? মাইকেল মধুসূদনের তো এ মোহ বহু আগেই ভেঙ্গেছিল। আমরা আশা করবো মানসিক হাসপাতালে অবস্থানের নীরব মুহূর্তে আপনারাও আত্মস্থ হতে পারবেন। এবং মাইকেলের মত আপনাদেরও মোহ-ভঙ্গ হবে। বিদেশের মানসিক হাসপাতাল কিংবা আত্মহত্যার চাইতে সুখ-দুঃখ মিশ্রিত স্বদেশের সাধরণ জীবন কি অনেক বেশী শ্রেয় নয়?

রচনাকাল: ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৮৭

www.pathagar.com

বন্যা, পুরস্কার এবং ওয়াংয়ের খবর

বসে বসে গত কয়দিনের পত্র-পত্রিকার পাতায় চোখ বুলাচ্ছিলাম। পত্রিকার পাতা জুড়ে রয়েছে বন্যার বিচিত্র খবর। বন্যার সচিত্র সংবাদগুলো দেশের বিভিন্ন এলাকার মানুষের দুঃখ দুর্দশার চিত্র তুলে ধরেছে বেশ স্পষ্টভাবেই। কোথাও খাবারের আশায় মানুষের দীর্ঘ লাইন। কোথাওবিশুদ্ধ পানির আশায় ভেলা অভিযান। কোথাও ডুবে যাওয়া ঘরের চালে দাঁড়িয়ে মানুষ---চোখে তাদের সাহায্যের আকুতি। এর পাশাপাশি রয়েছে ত্রাণ শিবিরের চিত্রও। এখানেও ত্রাণ মিলে না আর্তমানুষের। খাবার অসুবিধে, থাকার অসুবিধে, চিকিৎসার অসুবিধে। এক কথায় বন্যা যাদের পেয়েছে তাদের বাঁচার সাধ অনেকাংশেই মিটে গেছে।

বন্যাপীড়িত এই যে দুঃস্থ মানুষ, তাদের জন্য সমাজের মানুষের দরদ নেই তাই বা বলি কি করে? পত্রিকার পাতা জুড়ে রয়েছে বন্যার্ত মানুষের জন্য সাহায্যের আবেদন। সরকারী বেসরকারী দলসহ বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোষ্ঠী করেছেন এই আবেদন। আবেদনের পাশাপাশি বিভিন্ন মহলের প্রদত্ত সাহায্যের ফিরিস্তিও ছাপা হচ্ছে পত্রিকার পাতায়। এসব ইতিবাচক সাড়া দেখে মনে আশা জাগে—বন্যার্তরা হয়তো বেঁচে যাবে। কিন্তু এর পাশাপাশি আশাহত হওয়ার মত খবরও নজরে পড়ে। কোথাও দেখা যায় একপক্ষের ত্রাণ তৎপরতায় অন্য পক্ষ বাধা দিচ্ছেন, কিংবা নেতৃস্থানীয় কারো পথই রোধ করে বসে আছেন কেউ। কোথাও দেখা যায় বন্যার্তদের নামে চাঁদা তুলে আপন পকেটে পুরছে কেউ। এতটুকুতেই শেষ হলে হয়তো বলার তেমন কিছু ছিল না। কিন্তু যখন দেখি বাধ ভাঙ্গার গুজব রটিয়ে ভয়ার্ত গ্রামবাসীকে গ্রাম ছাড়া করে মানব সন্তানদের লুণ্ঠন কর্মে ব্যস্ত হতে--- তখন মনে প্রশ্ন জাগে বৈ কি! এর পাশাপাশি রিলিফের আটায় ভুসির ভেজাল কিংবা রিলিফের চাউল ও টিন আত্মসাতের সংবাদ তো রয়েছেই। এসবের প্রতিবিধানে কিছু কিছু তৎপরতা যে পরিদৃষ্ট হয় না তা নয়। যেমন আমার সামনেই রয়েছে ত্রিশ মণ চাউল সহ দু'ব্যক্তি গ্রেফতারের সংবাদ। আর পত্রিকার কল্যাণে অতি সাধারণ এই দু'ব্যক্তির ছবি দর্শনের সৌভাগ্যও

www.pathagar.com

আমাদের হয়েছে। কিন্তু যাদের ছবি ছাপা যায় না কিংবা যাদের দুর্নীতির খবর স্পষ্ট লিখা যায় না তারা নিশ্চয় অসাধারণ মানুষ। আর তাদের আত্মসাতের পরিমাণ ও বোধহয় 'ত্রিশ' অঙ্কের মত কোন সাধারণ অঙ্ক নয়। কিন্তু প্রতিবিধানের আসল কর্মটি সম্পাদিত না হলে এসব অসাধারণ অঙ্কের সংবাদ ছাপিয়েই বা লাভ কি?

সে যাক। এসব তো আর নতুন কোন কথা নয়, তাই এ নিয়ে বেশী কিছু বলারও কোন মানে নেই। কিন্তু এবারের বন্যা সংক্রান্ত ত্রাণ তৎপরতার একটি ঘটনা আমার কাছে বেশ অভিনব বলে মনে হয়েছে। ঘটনাটির দিকে তাকালে প্রথম দৃষ্টিতে একে মনে হয় 'না-উপহার', 'না-ত্রাণ', 'না-দুর্নীতি'। কিন্তু সব তো আর 'না' হতে পারে না। তাকে একটা কিছু তো অবশ্যই হতে হবে। তবে সে বিচার একটু পরেই হোক। তার আগে ঘটনাটা জেনে নেয়া যাক। 'ত্রাণসামগ্রী দিয়ে পুরস্কার' শিরোনামের খবর-টিতে বলা হয়ঃ গত সংসদ নির্বাচনে যারা খেটেছিলো, তাদেরকে এবার ত্রাণসামগ্রী দিয়ে পুরস্কৃত করেছেন নির্বাচিত সংসদ সদস্য (মন্ত্রী ও বটে)। ভদ্রলোক সম্প্রতি নিজ নির্বাচনী এলাকা সফরের সময় ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করেন। তিনি যে পাঁচটি গ্রামের জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে রিলিফ দ্রব্য বিতরণ করেন, তার মধ্যে মাত্র দু'টি গ্রাম ছিল বন্যাকবলিত। উল্লেখ্য, উক্ত পাঁচটি গ্রামের বাসিন্দারা নির্বাচনকালে ঐ সংসদ সদস্যকে অকুণ্ঠ সমর্থন জানায় এবং নির্বাচনকালে বিভিন্ন মিছিল ও মিটিং-এ যোগ দেয়। এ ঘটনায় সে অঞ্চলের জনমনে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। তারা মনে করছে, উক্ত সংসদ সদস্য ত্রাণসামগ্রী দিয়ে যেন নির্বাচনের ঋণশোধ করলেন।

পাঠকবর্গের সামনে এতক্ষণে নিশ্চয়ই ঘটনাটির স্বরূপ উদঘাটিত হয়েছে। সারা দেশে যেখানে ত্রাণসামগ্রীর স্বল্পতা, যেখানে বন্যাপীড়িত দুঃস্থ মানুষ সাহায্যের আশায় বিনিদ্র প্রহর গুনছে, সেখানে দেশের একজন মন্ত্রী কি করে বন্যামুক্ত রাজনৈতিক সমর্থকদের মধ্যে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করলেন? জাতীয় দুর্যোগের সময় বন্যা নিয়ে এই হীন রাজনৈতিক চালটি চালার সুবুদ্ধি (?) তিনি কোত্থেকে পেলেন? দেশের রথীমহারথীদের এই হাল দেখে মানুষ যদি সাহায্যের হাত বাড়াতে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে, তাহলে তাদের কি খুব বেশী দোষ দেয়া যাবে?

বন্যার বিচিত্র খবর পড়ে পড়ে মনে যখন নানা ভাবনা দোল খাচ্ছিল,

www.pathagar.com

তখন 'ওয়াংয়ের নতুন জীবন' শিরোনামের খবরটি আমার মধ্যে যেন নব চেতনার সৃষ্টি করলো। চীনের লিয়াওনিং প্রদেশের তাইয়ান কাউন্টির এক কৃষকের কন্যা ওয়াং। ওয়াং-এর পিতা বোবা ও কালা এবং কন্যার প্রতিও তার নেই কোন মমত্ববোধ। আর শিশুটির মা একজন মানসিক প্রতিবন্ধী। ঐ পরিবারের কোন ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশীও নেই। তাই ওয়াং যখন একেবারেই ছোট, তখন থেকেই সে পরিবারটির শুয়োরের পালের সাথে বড় হতে থাকে। শুয়োরের দুধ খেয়ে সে বড় হয়। সে শুয়োরের মত হামাগুড়ি দিয়ে চলতো এবং অন্যদের সাথে তার আচরণও ছিল শুয়োরের মত। ১৯৮৩ সালে মনস্তত্ত্ববিদরা দেখেন যে, নয় বছরের এই শিশুটির বুদ্ধি সাড়ে তিন বছরের অন্য শিশুর বুদ্ধির মতোই। রং সম্পর্কে তার কোন ধারণা ছিল না এবং কোন চীনা ব্যক্তিত্বের কথাও সে জানে না। তাঁরা পরীক্ষা করে দেখেন যে, এই রকম হওয়ার কারণ কোন জটিল রোগ নয়, বরং শুয়োরের সাথে বসবাস ও বড় হওয়াই হলো এর আসল কারণ। ১৯৮৪ সালে চীনের চিকিৎসা বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় ও আনসান ইনস্টিটিউট অব সাইকোমেট্রি এই শিশুটির চিকিৎসার জন্য এক পরীক্ষামূলক পদ্ধতির প্রয়োগ শুরু করে। ওয়াংকে একটি নতুন পরিবেশে নিয়ে এসে প্রাত্যহিক কর্মকাণ্ড ও চিত্তবিনোদনের মাধ্যমে তাকে মানবীয় শিক্ষা প্রদান করা হয়। এখন তের বছরের বালিকাটি প্রায় ছয় শ' চীনা ব্যক্তিত্বের জীবনী পড়তে পারে, শিশুদের গান গাইতে পারে এমনকি কিছু কিছু গৃহস্থালী কাজও করতে পারে।

ওয়াং তো মানব শিশুই ছিল। কিন্তু মানবীয় লালন পালনের অভাবে এবং ভিন্ন প্রাণীদের সাথে বসবাসের কারণে সে শুয়োরের মত আচরণে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু সেই ওয়াংকে আবার মানবীয় পরিবেশে ফিরিয়ে এনে মানবীয় শিক্ষার মাধ্যমে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে।

আমাদের দেশে বন্যা পীড়িত মানুষের ত্রাণসামগ্রী নিয়ে যারা ছিনিমিনি খেলে, বাঁধ ভাঙ্গার গুজব ছড়িয়ে যারা বন্যা ভীত মানুষের সর্বস্ব লুণ্ঠন করে, যারা বন্যা নিয়ে হীন রাজনীতিতে লিপ্ত হয়, তাদের স্বরূপ দেখে আমার বারবার ওয়াং-এর কথাই মনে পড়ে। তারাও বোধহয় ওয়াং-এর মত মানবীয় পরিবেশের অভাবে প্রাণীবৎ আচরণে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। এদের আবার স্বাভাবিক ও মানবীয় আচরণে অভ্যস্ত করতে হলে আমাদেরও বোধ হয় শিক্ষাদীক্ষা ও পরিবেশের নতুন দিগন্ত রচনা করতে হবে। কিন্তু এই নব উদ্যোগে আমরা এগিয়ে আসবো কি?

রচনাকাল : ৩০ আগস্ট ১৯৮৭

www.pathagar.com

হাসপাতালের সুখ দুঃখ

গত ২৬শে জুনের কথা। ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথেই আমার পুত্র সন্তানটিকে নিয়ে যেতে হয়েছিল হাসপাতালে। সেই সুবাদেই ঢাকার দু'টি হাসপাতালের সাথে আমার প্রায় একুশ দিনের পরিচয়।

হাসপাতালের সাথে এত দীর্ঘদিনের পরিচয় এর আগে আর আমার কখনো হয়নি। তাই ভাসা ভাসা অনেক ধারণাকেই এবার কিছুটা স্পষ্ট ভাবে দেখার সুযোগ পেলাম।

হাসপাতাল সম্পর্কে তো আমাদের নানা অভিযোগঃ এখানে চিকিৎসা হয় না, ডাক্তাররা কসাই, নার্সরা সেবার বদলে সাজগোজ আর গল্প গুজবেই ব্যস্ত থাকে বেশী, সব ফাঁকিবাজি ইত্যাদি ইত্যাদি। এরপরেও আমরা হাসপাতালে যাই, আসলে বিপদে পড়েই যাই। সেখানে থেকে কেউ সুস্থ হয়ে ফিরে আসি, আবার কেউ কেউ অসুস্থতার যাতনা সইতে না পেরে চলে যায় পরপারে। যারা সুস্থ হয় তারা হাসপাতাল জীবনে রুষ্ট হলেও বিদায় বেলায় কিছুটা হৃষ্টচিত্তেই ঘরে ফিরে। আর যারা অসুস্থতার যাতনা সইতে না পেরে এই দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়, তাদের আপনজনদের কাছে তো হাসপাতাল বিভীষিকা হিসেবেই রয়ে যায়।

এই যে হাসপাতাল, সেখানকার অনেক কিছুই আসলে আমাদের মনের মত নয়। আর এ জন্য আমাদের অভিযোগও বেশ শানিত। কিন্তু শানিত অভিযোগেই তো আর সমস্যা মিটে যাবে না। এবং এ ব্যাপারে একক ভাবে কাউকে অভিযুক্ত করাও বোধহয় ঠিক হবে না। এ প্রসংগে আসুন চিকিৎসার ব্যাপারেই একটু কথা বলি। আমার মুমূর্ষ পুত্র সন্তানটির বয়স তখন দু'দিন। ডাক্তার বলেন, এখনই ওর একটি এক্স-রে করাতে হবে। উনি ওয়ার্ড বয়কে ডেকে একটা কাগজে লিখে দিলেন এবডোমিন এক্স-রের কথা। পরে ওয়ার্ড বয়কে আবার ডেকে বললেন, শুধু 'এবডোমিন' নয়, ওর একটা 'আপ সাইড ডাউন' এক্সরেও করাতে হবে। এবং ডাক্তার সাহেব সে কথা কাগজেও লিখে দিলেন। ডাক্তার আমাকে বললেনঃ বেশ রাত হয়ে গেছে, আপনিও সাথে যান, একটু বুঝিয়ে কাজটা সেরে আসুন। ঘড়িতে তাকিয়ে

www.pathagar.com

দেখি রাত তখন এগারটা। এক্স-রে ভবনে গিয়ে দেখি এক্স-রে ম্যান তখন খাওয়ায় ব্যস্ত। তাঁর খাওয়া পর্যন্ত শিশুটিকে নিয়ে আমাদের অপেক্ষা করতে হল। অনুরোধের পর খাওয়া শেষে তিনি এলেন এক্স-রে কক্ষে। ভারিক্কী চালে তিনি তাঁর কাজ শুরু করলেন এবং শুধু এবডোমিন এক্সরেটাই করলেন। আমি বাকী এক্সরেটাও করে দিতে বললাম। কিন্তু এক্স-রে ম্যান নারাজ। তিনি বললেন আর করা সম্ভব হবে না। আমি বললাম: কেন, ডাক্তার তো 'আপ সাইড ডাউন'ও করতে বলেছেন। কাগজেই তো লেখা রয়েছে। এক্স-রে ম্যান তখন বললেন, ডাক্তার যা বলেছেন আমি তাই করেছি, আপনার কথায় আমি কাজ করতে পারব না। আমি তখন কাগজের লেখাটা দেখালাম। তিনি বললেন, 'আপ সাইড ডাউন' এক্স-রে হয় না, যান ডাক্তারকে আসতে বলেন। আমাদের বাকবিতণ্ডার এই দীর্ঘ সময়ে ওয়ার্ড বয় একটি কথাও বলল না। অথচ এক্স-রে করিয়ে আনার দায়িত্বটা কিন্তু ওরই ছিল। ডাক্তার ওকে দুই এক্স-রে'র কথা বুঝিয়েও দিয়েছিলেন। কিন্তু ও যেন নীরবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এক্স-রে ম্যানকেই সমর্থন করে গেল। আমার মনে হলো, কোথাও যেন একটা গোলমাল আছে। তাই আর কথা না বাড়িয়ে চলে এলাম ওয়ার্ডে। ডাক্তারকে সব খুলে বললাম। ডাক্তার বললেন: ঠিক আছে, হাতের কাজগুলো সেরে আমি নিজেই যাব। এর মধ্যে ওয়ার্ডে দেখা হয়ে গেল ওয়ার্ড মাস্টারের সাথে। ভদ্রলোক আমার পরিচিত। তিনি ঘটনাটি শুনে বেশ সহানুভূতির সাথে আমার হাত থেকে এক্স-রের কাগজটি নিলেন। এবং এক্স-রেম্যানের সাথে আলাপ করে এসে বললেন: আমার সাথে চলুন। এক্স-রে সেরে আসার পথে ওয়ার্ড মাস্টারের সাথে আলাপ প্রসংগে হাসপাতালের অনেক কথাই শুনলাম। জানলাম কর্মচারীদের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের কথা। এও জানলাম যে, হাসপাতালে ডাক্তারদের বদলীর রেওয়াজ থাকলেও নীচের দিকের অনেক কর্মচারীর বদলীর কোন রেওয়াজ নেই। স্থানীয় নানা কারণেই এসব কর্মচারী বেশ বেপরোয়া। অনেক সময় ডাক্তাররাও তাদের কাছে অসহায়।

আসলে চিকিৎসার ক্ষেত্রে ডাক্তার, নার্সদের ভূমিকাই সব নয়, ট্যাকনিক্যাল হ্যাণ্ড ও ওয়ার্ডবয়সহ সবার সহযোগিতাই এ ক্ষেত্রে প্রয়োজন। এক্স-রে করতে গিয়ে একথাটি আমি হাড়ে হাড়ে টের পেলাম। আর চিকিৎসার ক্ষেত্রে ডাক্তার-নার্সদের ভূমিকাই বা কেমন? অনেক ডাক্তার আছেন,

www.pathagar.com

কোনমতে রুটিন ওয়ার্ক করেই তারা সন্তুষ্ট থাকতে চান। আর নার্স? একদিন তো দেখি, এক নার্স সিরিঞ্জে ইনজেকশন ভরে আমার শিশুর গায়ে পুশ করার মুহূর্তে তিনি স্পিরিট চাচ্ছেন। ডাকসাঁইটে একটি হাসপাতালে সামান্য স্পিরিট নেই, সেটা তো এমনিতেই লজ্জার কথা। আর এই কথাটা নার্স আগে বললেই তো পারতেন। ওষুধপত্র সবই যখন বাইরে থেকে কিনে আনতে হয় তখন স্পিরিটও না হয় কিনে আনতাম। কিন্তু ইঞ্জেকশন পুশ করার সময় কি তা বলা শোভনীয়? তখন রোগী কোথায় পাবে স্পিরিট! এ ধরনের সেবার প্রতিবাদ করায় নার্স তো আমার বোনের সাথে রীতিমত বচসায় লিপ্ত হয়ে গেলেন।

এগুলোই কিন্তু ডাক্তার নার্সদের ভূমিকার সব কথা নয়। ডিউটির বাইরেও আমার শিশুটির খবর নিয়ে গেছেন এমন নার্সেরও দেখা পেয়েছি। আর ডাক্তারের সব প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়ে আমার শিশুটি যখন পর-পারে চলে গেল তখন কর্মরত ডাক্তারটির চোখ থেকে টপটপ করে পানি পড়তেও দেখেছি। এমন ডাক্তারও দেখেছি, হরতালের দিন অন্য ডাক্তার আসতে পারবে কিনা এই সন্দেহে যিনি নাইট ডিউটি শেষেও হাসপাতালে থেকে গেছেন। আসলে ডাক্তার নার্সদের কাছ থেকে রোগী পক্ষ যেমন আদর্শ ভূমিকা আশা করেন, তেমনি রোগী পক্ষ থেকেও তো ডাক্তার-নার্সরা কিছু আশা করেন। দীর্ঘ দিনের সেবার পরে যে রোগী সুস্থ হয়ে ঘরে ফিরেন, তিনি কি নার্সকে একটু বলে আসার কষ্ট স্বীকার করেন? আর ডাক্তারদের পরামর্শগুলোও কি রোগীরা সব সময় নিষ্ঠার সাথে পালন করে থাকেন? কখনো দেখা যায় শিশু সন্তান ওয়ার্ডের মেঝেতে মায়ের সহযোগিতায় দিব্যি পায়খানা পেশা-বের কর্ম সেরে নিচ্ছে। পাশের বেডেই হয়তো অপারেশনের কোন রোগী, কেউ হয়তো ইনফেকশনে ভুগছে। এ জাতীয় নানা কর্মেই হয়তো অনেক সময় ডাক্তার-নার্সদের মেজাজও তিরিক্ষে হয়ে যায়। আসলে হাসপাতালের আদর্শ পরিবেশের জন্য উভয় পক্ষেরই যথার্থ ভূমিকার প্রয়োজন।

এছাড়াও আমাদের চিকিৎসা ক্ষেত্রে রয়েছে আরো নানা সমস্যা। হাসপাতালের যেমনি রয়েছে আর্থিক সংকট তেমনি রোগীরও থাকে আর্থিক অনটন। ফলে অর্থ সংকটও আমাদের চিকিৎসা ক্ষেত্রে একটি বড় বাধা। তাছাড়া চিকিৎসা সরঞ্জামেরও রয়েছে অভাব। সারা ঢাকা শহর ঘুরে আমার শিশু সন্তানটির জন্য পেলাম না একটি এবডোমিন বেল্ট।

www.pathagar.com

অবশেষে এক দোকানের নিজস্ব তৈরী বেল্ট কিনে নিয়েও তা বাজে লাগানো গেল না।

এসব সমস্যা তো আছেই। দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির সাথে সাথে এক দিন হয়তো এসব সমস্যা কেটে যাবে। কিন্তু একটি সমস্যা বোধ হয় এই মুহূর্তেও আমরা কাটিয়ে উঠতে পারি। আর তা হলো সম্পর্কের সমস্যা। এ সমস্যার এক পাড়ে দাঁড়িয়ে আছেন রোগী পক্ষ এবং অপর পাড়ে হাসপাতাল পক্ষ। এই দুই পাড়ে অবস্থানকারীরা যদি পরস্পরের প্রতি আরো বেশী সহানুভূতি ও সহমর্মশীল হয়ে ওঠেন, তা হলে চিকিৎসা ক্ষেত্রে অনেক তিক্ততারই অবসান হতে পারে।

রচনাকালঃ ২ আগস্ট ১৯৮৭

www.pathagar.com

শিশুদের বেড়ে ওঠার এ কেমন পরিবেশ

"বাসান দিয়ে সোতল করেছি। তারপরেতে কাপড় পরেছি। যাবো এবার বাইরে বেড়াতে। কে কে যাবে আমার সাথেতে।"—এটি আমার শিশু কন্যার নিজস্ব ঢঙের একটি ছড়া। এই কিছু দিন আগেও গোসল করে এসে জামা কাপড় পরতে পরতে সুর করে এই ছড়াটি গাইতো। পাঠকবর্গ হয়তো ওর ছড়ার 'বাসান' ও 'সোতল' শব্দ দুটির সাথে পরিচিত নন। ও উচ্চারণের ঝামেলা এড়াতে সাবানকে বলতো 'বাসান' আর গোসলকে বলতো 'সোতল'। এতক্ষণে নিশ্চয় আমার মেয়ের ছড়াটির মর্ম পাঠকবৃন্দের বোধগম্য হয়েছে।

আমরা জানি, শিশু মানেই এক একজন হাসিখুশী মানুষ। পৃথিবীর জটিলতা কুটিলতা ওদের স্পর্শ করে না। তাই সামান্য গোসলেও ওরা অফুরন্ত আনন্দ পায়। আর গোসল শেষে নানা কথার মিষ্টি দিয়ে ওরা সে আনন্দ ছড়িয়ে দেয়। আমার মেয়েটিও সেই শিশুজগতেই বাস করতো। তাই গোসল শেষে কাপড় পরে সে মনের খুশীতে বেড়াতে যাবার আহবান জানাতো সবাইকে।

কিন্তু এখন ও আর গোসল শেষে ওর প্রিয় ছড়াগানটি গায় না। কারণ ইতিমধ্যেই ও জেনে গেছে, বেড়াতে যাওয়াটা আসলে ততটা আনন্দের ব্যাপার নয়। এ পথে আছে নানা বিপদ। রিক্সায় উঠে ও টের পেয়েছে বাস-ট্রাকের পাশাপাশি এ যানটি নিরাপদ নয়। সে গাড়ীর ধাক্কায় রিক্সা হতে পড়ে গিয়ে আহত হতে দেখেছে মাকে। তাই বেপরোয়া বাস-ট্রাক আর রিক্সা চালকদের উপর ভীষণ ক্ষুব্ধ ও। ওদের দেখলে ও দূর থেকেই করতে থাকে ভর্ৎসনা। রিক্সা চালকদের বলেঃ এ ভাই আস্তে চালান, এক্সিডেন্ট হলে তো হাত-পা ভেঙ্গে যাবে। এসব কারণেই বোধ হয় ও এখন বায়না ধরেছেঃ আব্বু একটা গাড়ী কিন না।

এ বয়সেই বহুবার বোমার আওয়াজে ঘুম ভেঙ্গেছে আমার ছোট্ট মেয়েটির। হরতালের এক সকালে তো বোমার আওয়াজে আর্ত চিৎকার করে ও ঘুম থেকে জেগেই উঠলো। চোখে তার প্রশ্নঃ এ কিসের আওয়াজ?

www.pathagar.com

মুহুর্মুহু বোমা ফাটার আওয়াজে ও প্রতিবাদী হয়ে উঠলো। নিজস্ব ভাষায় বকে উঠলো এ কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে বলেঃ ঐ দেখ 'আনজাদ,' কেমন দুষ্ট হয়ে গেছে। প্রথমে বিশ্বাস করিনি। কিন্তু ভাল করে লক্ষ্য করতেই দেখি, ওর চোখ ভুল দেখেনি। পরিচিত টোকাই আমজাদ মিছিল থেকে বোমা নিক্ষেপ করছে পুলিশদের প্রতি। বেচারা পুলিশ তখন দৌড়ে এসে আশ্রয় নিল আমাদের গলিতে। এ দৃশ্য দেখে ও বকতে থাকলো টোকাইদের। আবার যখন ও দেখলো পুলিশরা লাঠি হাতে তাড়াচ্ছে টোকাইদের, তখন ও আবার চলে গেল টোকাইদের পক্ষে।

এসব দৃশ্য দেখে এ বয়সেই ও বুঝে নিয়েছেঃ এ পৃথিবীতে বাপ-মার আদর সোহাগটাই সব নয়। তাই ভয়-ভীতি ও বিপদ-আপদের আশংকা এসেও বাসা বেঁধেছে ওর বুকে। সেদিন বিকেলেই তার প্রমাণ পাওয়া গেল স্পষ্ট ভাবে। বাসার সামনের ছোট মাঠটিতে ছেলেপেলেদের খেলতে দেখে ওর সেকি উৎসাহ। বাধ্য হয়ে দোতলার মেয়েটির সাথে ওকে পাঠালাম নীচে। কিন্তু মাঠে গিয়ে হৈচৈ ও দৌড়াদৌড়ির দৃশ্য দেখে ও যেন ভয়পেয়ে গেল। তাই সাথের মেয়েটির হাত চেপে ধরলো ও। মেয়েটি যতই ওকে বোঝাতে চায় কিছু না, ও ততই যেন আরো শক্ত করে ধরে থাকে ওর হাত। এক সময় দেখলাম ও মেয়েটির কোলেই উঠে গেছে। তখন মেয়েটিকে ডেকে বললাম, ওকে বাসায় দিয়ে যেতে।

আশা ছিল জ্ঞান গরিমা, শক্তি সাহসে মেয়ে আমার হবে মহীয়ান। কিন্তু চার পাশের পরিবেশ এবং মেয়ের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে সে আশায় যেন কিছুটা ভাটা পড়েছে।

অগত্যা ভাবলাম, আর কিছু না পারলেও অন্তত নৈতিক দিক থেকে মেয়েকে আমার উন্নত করে তুলবো। তাই বাসার পরিবেশে মেয়েকে যখন ন্যায়নিষ্ঠ কথা বলতে শুনি, বড়দের অনুকরনে নামায পড়তে দেখি, রোযার বায়না ধরতে শুনি তখন মনটা আনন্দে ভরে ওঠে।

কিন্তু বাসার পরিবেশটাই তো সব নয়। শিশুদের বেড়ে ওঠার ব্যাপারে আত্মীয়-স্বজন, উৎসব-অনুষ্ঠান ও সামাজিক পরিবেশও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে দেখা দেয়। কোন কোন সময় মনে হয়, মেয়েটা যেন আমার নয়, আত্মীয়-স্বজন, ও পাড়া প্রতিবেশীদেরই। তাঁদের কল্যাণে এই বয়সেই এই ছোট্ট মেয়ের বার্থ ডে, ম্যারেজ ডে, ভিসি আর, টেলিভিশনসহ নানা অনু-

www.pathagar.com

স্থানের পাঠ শেষ হয়ে গেছে। আপাততঃ এতদসংক্রান্ত শিশু সুলভ নানা পাকামোকে বেশ উপভোগ করা গেলেও জানি না সামাজিক এই পথ পরিক্রমা ভবিষ্যতে কি পরিণতি ডেকে আনবে।

আসলে এ সমাজে জীবন যাপনের হাজারো সমস্যার মধ্যে সন্তান সন্ততিদের গড়ে তোলার কাজটি যেন বেশ দুরূহ হয়ে পড়েছে। আমরা সবাই যেন এক আতঙ্কের মধ্যে বসবাস করছি। নিরাপত্তাবোধ যেন আমাদের জীবন থেকে নির্বাসিত হয়ে গেছে। এ অবস্থায় ছেলে মেয়েদের স্কুলে পাঠানোও আমাদের জন্য কঠিন হয়ে পড়েছে। তাই বোধ হয় আক্ষেপ করে কবি বলে ওঠেন: সমাজ সংসারে এখন/নেই তো মানবিক আয়োজন/ নেই তো শিশুর বেড়ে ওঠার/পবিত্র অঙ্গন।

আমার সন্তান বড় হয়ে কেমনটি হবে তা অমার কাছে স্পষ্ট নয়। আর বড় হয়ে সে-ই বা এ জীবন ও জগৎকে কোন দৃষ্টি ভঙ্গিতে দেখবে তাও জানি না। তবে যাদের সন্তান সন্ততি এখন কিছুটা বড় হয়েছে, জীবন ও জগৎ সম্পর্কে তাদের অভিমতটা এমুহূর্তেই জানা যায়। চাকার বেলা ইসলাম পত্রিকার চিঠিপত্রের কলামে তার অভিমতটা স্পষ্ট ভাবেই জানিয়েছে।

সে লিখেছে: "অনেক বাধাবিপত্তি, অনেক কিছুর পর অবশেষে বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের সমাপ্তি হতে চললো। অবকাশ পেলাম কিছুটা (অন্তত ভর্তির চিন্তা নেই। নেই সেসন জটের টেনশন)। মাইক্রোস্কোপ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে এবার একটু দেখতে চাইলাম নিজের অতীত। প্রিয় মানুষের মুখ। কারা এসেছিল, কারা চলে গেল। আশ্চর্য! এই চব্বিশের জীবনে তেমন কাউকেই খুঁজে পাওয়া গেল না, যার জন্য অন্তত একটি নিঃসঙ্গ বিকেল আমি স্মৃতির তাঁত বুনবো। অথচ খুব স্পষ্ট করে বর্ণ, গন্ধ, স্পর্শ পর্যন্ত মনে গেঁথে আছে সেই সব স্মৃতির। খালপাড়ের সিঁদুরমুখী আম গাছের একটি বৃন্তচ্যুত আম—আঠাল রস লেগে আছে যার বোঁটায়, ঝরে পড়া লক্ষ লক্ষ জাম, দুপুর রোদ্দুরে কি উষ্ণ সে সব। বৃষ্টিতে হাঁটু জলে ডুবে যাওয়া ঘাস। কদম, বাতাবী লেবুর গন্ধ কোন্‌টা ভুলেছি? সবই তো স্মৃতির নকশী কাঁথা হয়ে গেছে। অথচ সেখানে নেই কোন মানুষের ছায়াপথ। শুধু একজন। আমাদের বাবা। কখনো ফিরে না আসার কথা দিয়ে যে চলে গেছে। আসলে পৃথিবীটা যদি বাবার করতলের মতো বিশ্বস্ত হতো। যদি হতো তার স্নেহের মত সুবর্ণ পত্রঝরা। তা হলে কি একটি সিঁদুরমুখী

www.pathagar.com

আম অথবা কমদ ফুলের চেয়ে একটি মানুষ বড় হতো না?"

বেলার মত আমার মেয়ের কাছেও বোধ হয় এই পৃথিবী তেমন বিশ্বস্ত নয়। মা বাবার কাছেই যেন তার সব আশ্রয়। অথচ শিশুর বেড়ে ওঠার জন্য শুধু বাবা মার নয়, এই সমাজ ও মানুষের আশ্রয় এবং সযত্ন লালনও কাম্য। আর বেলার ভাষায় এ জন্য মানুষের তো ফুলের চাইতেও বড় হওয়া প্রয়োজন। বেলার জন্য, আমার মেয়ের জন্য আমরা তো তা-ই চাই। কিন্তু আমাদের সেই চাওয়া পূর্ণ হবে কি?

রচনাকাল : ১৭ মে ১৯৮৭

www.pathagar.com

প্রভু ভক্তির স্বরূপ সন্ধান

দিন কয়েক আগে বাংলাদেশ ব্যাংকে গিয়েছিলাম একটি চেক ভাঙাতে। বাংলাদেশ ব্যাংকে চেক ভাঙানোর এটাই আমার প্রথম অভিজ্ঞতা। চেক জমা দিয়ে যথারীতি টোকেন নিলাম এবং নির্দিষ্ট কাউন্টারে গিয়ে কিছুক্ষণ পর খবর নিলাম। না, তখনো চেক ক্লিয়ার হয়ে আসেনি। কি আর করা, অগত্যা কাউন্টারের সামনে বিস্তৃত অঙ্গনে পায়চারি শুরু করে দিলাম। একথা স্বীকার করতেই হয় যে, অন্যান্য ব্যাংকের তুলনায় বাংলাদেশ ব্যাংকে পায়চারির সুবিধাটা একটু বেশীই। জানি না এজন্যই কিনা, চেক জমা দেয়ার মিনিট পনের পরে গিয়েও চেকের টাকা তুলতে পারলাম না। পাশের একজনকে জিজ্ঞেস করায় তিনি বললেনঃ এত অল্প সময়ের মধ্যেই অধীর হয়ে পড়লেন, এখনো তো এক ঘন্টা পুরো হয়নি। তখন বাণিজ্যিক ব্যাংক গুলোর কথা মনে পড়ে গেল। সেখানে তো সাধারণত পাঁচ মিনিটের মধ্যেই চেক ক্লিয়ার হয়ে যায়। কিন্তু জানি না, বাংলাদেশ ব্যাংকে চেক ক্লিয়ার হতে এত সময় লাগার কারণ কি ?

একদিকে অফিসে যাওয়ার তাড়া অপরদিকে অপেক্ষার যাতনা---এই যখন আমার অবস্থা তখন হঠাৎ করে নজর পড়লো পাদুকার উপর। চকিতে মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল। ভাবলাম, অপেক্ষার এই অবসরে ধুলিধূসর জুতোজোড়া পালিশ করে নিলেই তো হয়। তাতে পাদুকার চেহারাও পাল্টাবে আর অপেক্ষার অবসাদও হবে দূর।

যেই ভাবা সেই কাজ। ব্যাংকের দরজা পেরিয়ে নামলাম রাস্তায়। ডানে বাঁয়ে তাকাতেই নজরে পড়লো পালিশওয়ালার অবস্থান। বাছে গেলাম, জুতো জোড়া বাড়িয়ে দিলাম। বিনিময়ে পেলাম বহুপদভারে বিপর্যস্ত পালিশওয়ালার জাদুঘর শোভন স্যাণ্ডেল জোড়া। কোনমতে তাতে পা গলিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উপভোগ করতে লাগলাম পালিশ ওয়ালার নিপুণ কর্ম। বাংলা দেশ ব্যাংকের পাদদেশে মতিঝিল অফিস পাড়ার যেই অংশে আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম, তার আশে পাশে ছিল আরো রকমারি দ্রব্য সামগ্রীর পসরা। বিড়ি-সিগারেট, লুঙ্গি-গেঞ্জি, হলুদ-মরিচ থেকে শুরু করে আঙ্গুর-বেদানা সবই

www.pathagar.com

ছিল সেখানে মওজুদ। পালিশ ওয়ালার পাশে ছিল লুঙ্গিগেঞ্জির একটি দোকান। এক সময় সেখানে লক্ষ্য করলাম ঢাকা মেট্রোপলিটান পুলিশের নীল আর খাকি রঙের পোশাক পরা এক কনস্টেবলের উপস্থিতি। তিনি দোকানীকে বললেন স্কুল পড়ুয়া ছেলের পছন্দ হবে এমনএকটা লুঙ্গি দেখাতে। দোকানী বেশ কয়েকটা লুঙ্গিই দেখালেন, কিন্তু কনস্টেবলটি যেন কোন মতেই লুঙ্গি পছন্দ করে উঠতে পারছেন না। কনস্টেবলটির প্রতি আমার কেমন যেন একটু সহানুভূতি জেগে উঠলো। আমি যেচে গিয়েই চেকের মধ্যে একটি উজ্জ্বল রঙের লুঙ্গি দেখিয়ে বললামঃ এটি বোধ হয় আপনার স্কুল পড়ুয়া ছেলের পছন্দ হবে। কনস্টেবল ভদ্রলোক আমার দিকে না তাকিয়েই বেশ ঠাণ্ডা ভঙ্গিতে বলে উঠলেনঃ গ্রামে থাকেতো এইসব রঙ পছন্দ হবে না। লোকটার ব্যবহার আমার কাছে বেশ অশোভন বলে মনে হলো। তাই আমি আর কথা না বাড়িয়ে চুপ রইলাম। দেখলাম কনস্টেবলটা আরো কয়েকটি লুঙ্গি পরখ করে দরাদরি শেষে মলিন রঙের একটি গামছা লুঙ্গি কিনে নিলেন। দেখে স্বগতভাবে আক্ষেপ করেই বললাম, স্কুলের ছেলের জন্য এই পছন্দ! কিন্তু হঠাৎ করেই যেন আমার নাড়ীতে কামড় পড়লো। কনস্টেবল হিসেবে চাকরিরত আমার এক আপনজনের চেহারা ভেসে উঠলো। বেচারাদের বেতন এত স্বল্প যে, তাতে অন্নের চাহিদা মেটানোই কষ্ট। বস্ত্রের রঙরূপের বাছাই তো সেখানে অবান্তর। এতক্ষণে আমার প্রতি কনস্টেবলের সেই ঠাণ্ডা ব্যবহারের মর্মার্থ বোধগম্য হলো। আমার দেখানো লুঙ্গিটি সুন্দর হলেও তা কেনার সামর্থ্যতো কনস্টেবলটির ছিল না। আসলে বেচারার সাধ ও সাধ্যির মধ্যে বনি বনা না হওয়ায় আমার প্রস্তাবের সাথেও তার বনিবনা হলো না। কনস্টেবলটির সেই আচরণে সমাজ ও মানুষ সম্পর্কে আমার অজ্ঞতার বিষয়টিই যেন আবার প্রকট হয়ে উঠলো।

ততক্ষণে আমার জুতোর পালিশের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। পালিশ দুরস্ত পাদুকায় পদশোভা বর্ধন করে এবার ব্যাংকের উদ্দেশে রওয়ানা হলাম। বেশ আশা নিয়েই কাউন্টারে গেলাম। কিন্তু না, তখনো আমার চেক ক্লিয়ার হয়ে আসেনি। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি আধ ঘন্টা পার হয়ে গেছে। কর্মহীন অবস্থায় তখন সম্মানী হিসেবে প্রাপ্ত একশ' টাকার চেকটির মূল্যায়নে প্রবৃত্ত হলাম। এলিফ্যান্ট রোড থেকে আগার গাঁয়ের সেই রেডিও অফিসে যাওয়া-আসা, তারপর আবার এখন বাংলাদেশ

www.pathagar.com

ব্যাংকে চেক ভাঙানোর যাওয়া আসা—এতে সময় ও অর্থের যে ব্যয় ইতি মধ্যেই সাধিত হয়েছে, তাতে লাভের আর কিছু বাকি আছে কি?

পায়চারি করতে করতে কাউন্টার থেকে বেশ দূরেই এসে পড়েছি। দৃষ্টি প্রসারিত করতেই তখন চোখে পড়লো কয়েকটি দেয়াল পত্রিকা। ব্যাংক কর্মচারীদের সাহিত্য কর্মের স্মারক সেইগুলো। দেয়াল পত্রিকার নকশা জাতীয় একটি লেখা আমার দৃষ্টিকে কেড়ে নিল। 'প্রভুভক্ত' শিরোনামের এই লেখাটিতে তিনটি চিত্র অংকিত হয়েছে। প্রথম চিত্রে অংকিত দৃশ্যটি হলোঃ স্বামী তড়িঘড়ি করে প্রস্তুত হল অফিসে যাওয়ার জন্য। স্ত্রী দ্বারে দাঁড়িয়ে সহাস্যে বিদায় জানিয়ে স্বামীকে বললোঃ তাড়াতাড়ি এসে পড়ো যেন। স্বামী তাতেই কৃতার্থ হয়ে মাথা নীচু করে জবাব দিলঃ ঠিক আছে।

দ্বিতীয় চিত্রে অংকিত দৃশ্যটি হলো ঃ অফিস ছুটি শেষে স্বামী বেচারা গেল বস্‌থেকে বিদায় নিতে। বস্‌ বললেনঃ আমি আপনার কাজে খুশী, আপনার ড্রাফট চমৎকার। কাল একটু আগেই অফিসে আসবেন, জরুরী কাজ আছে। স্বামী বেচারা তাতেই কৃতার্থ হয়ে মাথা নিচু করে জবাব দেনঃ ঠিক আছে।

তৃতীয় চিত্রে অংকিত দৃশ্যটি হলোঃ কর্মক্লান্ত স্বামী বেচারা রাতে ঘুমিয়ে আছেন। এমন সময় পোষা কুকুরটির ঘেউ ঘেউ চিৎকারে তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। কুকুরের চিৎকারের কারণ খুঁজে পেতে তিনি জানালা খুললেন। তাকিয়ে দেখেন, কুকুরের তাড়া খেয়ে চোরটি দেয়াল টপকে পালাচ্ছে। তখন খুশী মনে দরোজা খুলে স্বামী প্রবর গেলেন কুকুরটির কাছে। কুকুরের গলায় আদর করে হাত বুলাতে বুলাতে তিনি বললেনঃ রাত জেগে জেগে এভাবেই পাহারা দিবি। কুকুরটিও তখন মাথা নীচু করে যেন বলে উঠলোঃ ঠিক আছে।

নকশাটি পড়ে মনে হলো, চিত্রগুলো আসলেই সঠিক। এ পৃথিবীতে সবারই কেউ না কেউ প্রভু আছেই। আর প্রভু মাত্রেই চান ভক্তরা তাঁর সেবায় হোক নিষ্ঠাবান, ভক্তরা তাঁর আজ্ঞা পালনে হোক যত্নবান।

কিন্তু সব জায়গায় প্রভু ও ভক্তের এই সম্পর্ক মোটামুটি রক্ষিত হলেও এক জায়গায় বোধ হয় আমরা দিচ্ছি ফাঁকি। কৃত্রিম প্রভুদের রোষানলে পতিত হই বলে তাদের বেলায় ফাঁকি দিতে আমরা ভয় পাই। কিন্তু

www.pathagar.com

যিনি আমাদের আসল প্রভু, তাঁর উদারতা ও মহানুভবতার সুযোগে তাঁর আজ্ঞা পালনেই আমাদের যত শিথিলতা।

কৃত্রিম প্রভুদের আজ্ঞা তো কেবল তাঁদের স্বার্থ রক্ষার জন্য, কিন্তু যিনি আমাদের আসল প্রভু তাঁর আজ্ঞা তো আমাদের কল্যাণের স্বার্থেই। তাহলে সেই মহা প্রভুর ভক্ত হতে আমাদের বাধা কোথায়?

ভাবনার রেষ কাটতেই গিয়ে হাজির হলাম কাউন্টারে। ততক্ষণে চেকের টাকা প্রস্তুত। টাকা ক'টি পকেটে পুরতে পুরতে মনে হল ব্যাংকে এসে আজ বোধ হয় বেশ লাভই হলো। ব্যাংকে না এলে তো আজকে প্রভুভক্তির এ স্বরূপ সন্ধান সম্ভব হতো না।

রচনাকাল: ১৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৭

www.pathagar.com

মুসা নামের ছেলেটি

এই নিয়ে ছেলেটা তিনবার গেল আর আসলো। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, ছেলেটা যাওয়ার সময় পরনের কাপড় ছাড়া আর কিছুই নিয়ে যায় না। এমনকি ওর জন্য কেনা পুরানো কাপড়গুলো নেয়ার কথা পর্যন্ত ও ভাবে না। অর্থ সম্পদের প্রতি এমনি নির্লিপ্ত ছেলেটি।

কালো রঙের এই ছিপছিপে ছেলেটি থাকে আমার একবোনের বাসায়। বয়স আর কত হবে, দশ কি বারো। প্রথম যখন ছেলেটি বাসায় আসলো তখন সবাই ভাবলো, এ আর কি কাজ করবে। কিন্তু দিন কয়েকের মধ্যেই ও প্রমাণ করে ছাড়লো, ও দেখতে ছোট হলেও কাজে ছোট নয়। ছেলের নিষ্ঠা ও তৎপরতা দেখে সবার মুখে হাসি ফুটে উঠলো। যাক, এতদিন পরে হলেও কাজের একটা ভাল ছেলে পাওয়া গেল। বাসায় কাজের লোক পাওয়া তো আজকাল খুব কষ্টসাধ্য ব্যাপার। সে জায়গায় যদি শুধু কাজের ছেলে নয়, একটি ভাল কাজের ছেলে পাওয়া যায়, তাহলে তো ঘরের সদস্য-দের মুখে হাসি ফোটারই কথা।

ফুলের মত মানুষের মুখের হাসিও বোধহয় দীর্ঘ সময় টিকে থাকতে পারে না। ফুলের পাপড়ির মত মানুষের হাসির পাপড়িও এক সময় ঝরে পড়ে। আমার সেই বোনের হাসিও একদিন ঝরে পড়লো। কারণ আর কিছুই নয়—সেই কাজের ছেলে। একদিন সন্ধ্যায় বোন আবিষ্কার করলেন, বিকেলে ডিম কিনতে পাঠানোর পর ছেলেটি আর বাসায় ফিরলো না। প্রথমে তো বোন একটু ভড়কেই গেলেন। না জানি ছেলেটি বাসার কত কিছু নিয়ে সরে পড়েছে। কিন্তু ভালভাবে খোঁজ-খবর নিয়ে দেখা গেল ছেলেটি বাসার কিছুই নেয়নি। বরং ওর সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে এমন জিনিস ও রেখে গেছে। তা হলে ও ভাগলো কেন? ডিম কিনতে পাঠানো টাকা দশটির প্রতিই কি ওর লোভ জাগলো? বোন নিজ থেকেই বলে উঠলেন: মাত্র দশটি টাকার প্রতি তো ওর লোভ জাগার কথা নয়। কারণ মাসোহারা হিসেবে ওর যে টাকা জমেছে সে টাকা তো এই দশ টাকার চাইতে অনেক বেশী। দশ টাকা নিয়ে ভাগলে তো ও ঠকার

www.pathagar.com

ভাগাই ভেঙেছে। আর টাকার জন্য না ভাগলে, ভাগার অন্য কোন কারণও তো দেখছি না। বাসার সবার সাথে ও বেশ হাসিখুশী ভাবেই ছিল। ওকে তো কখনো অসন্তুষ্ট মনে হয়নি।

বোন এভাবে অনেক কথাই বললেন, অনেক কিছুই ভাবলেন কিন্তু ছেলেটি হঠাৎ করে চলে যাবার কারণটি কিছুতেই খুঁজে পেলেন না। কিন্তু হঠাৎ করেই যেন বোন ছেলেটি চলে যাবার সূত্রটি খুঁজে পেলেন। বোন বললেনঃ ছেলেটি চোরও নয়, ছেঁচড়া ও নয়। আসলে ও হলো যাযাবর চরিত্রের ছেলে। এ চরিত্রের যারা মানুষ তাদেরকে কেউ ধরে রাখতে পারে না। এক জায়গায় অনেকদিন ওদের মন টেকে না। ওরা এক জায়গায় যায়, সবার মন জয় করে আবার উড়াল দেয়। ইংরেজী সাহিত্যের এই প্রাক্তন ছাত্রীর বিশ্লেষণটি আমার বেশ মনে ধরলো। বিশ্ববরেণ্য অনেক সাহিত্যিকের রচনাতেই এই ধরনের যাযাবর চরিত্রের খোঁজ পাওয়া যায়। আমার সমর্থন পেয়ে বোন বলে উঠলেনঃ দেখো, ছেলেটি আবার ফিরে আসবে।

মাসখানেক পর আমাদের অবাক করে দিয়ে ছেলেটি আবার ফিরে এলো। ছেলেটির নিরপরাধ অবয়ব। বাসার কেউ-ই ওকে বকা-ঝকা করলো না। কোথায় গিয়েছিলে জিজ্ঞাসা করায় ও বললোঃ আদমজীতে মা-বোনকে দেখতে গিয়েছিলাম। আবার চলে আসার কারণ জানতে চাইলে ও বললোঃ ক'দিন তো থাকলাম, আর ভাল লাগছে না দেখে চলে এলাম। আলাপ করে জানা গেল ওদের সংসার সুখের নয়। ওর মা এখন দ্বিতীয় স্বামীর ঘর করছে। গতর খেটেই ওদের সংসার চলে। তার উপর ওর বড় বোনটিকে নিয়ে হয়েছে আর এক জ্বালা। আর ওর সৎবাপটিও নাকি তেমন সুবিধের লোক নয়!

ছেলেটি আবার বাসায় কাজ করতে শুরু করলো। দু'একবার এসে ওর মা দেখা করে গেছে এবং যাওয়ার সময় ওর জমানো টাকা কড়ি-গুলোও নিয়ে গেছে। ছেলেটি ওসব অম্লান বদনেই দিয়ে দিয়েছে। এরপর ছেলেটি আর একবার উধাও হয়ে আবার যথারীতি ফিরে এসেছিল। বাসার লোকজন এবার আর তেমন অবাক হয়নি। কিন্তু তৃতীয় বার যখন ছেলেটি আবার উধাও হয়ে গেল, তখন বাসার সদস্যগণ একটু বিরক্তই হলো। বললোঃ এ ছেলেকে আর রাখা যাবে না। কখন আসবে কখন যাবে কোন

www.pathagar.com

ঠিক ঠিকানা নেই। অনেকদিন পরও যখন ছেলেটি আসলো না তখন বাসার সবাই ভাবলো ঃ ও বোধ হয় আর আসবে না। বাসায় নতুন কাজের লোক রাখা হলো। সংসারের চাকা ঘুরতে লাগলো নিজের নিয়মে। এবং এক সময় মুসা নামের কাজের ছেলেটির কথা সবাই গেল ভুলে।

কিন্তু মুসা সবাইকে অবাক করে দিয়ে আবার ফিরে এলো। এবার মুসাকে চিনতে একটু কষ্টই হলো। ও আগের চাইতে আরো লম্বা ও রোগাটে হয়ে গেছে। গায়ের রঙটা আরো বেশী কালো হয়েছে। হাত-পা কেমন শক্ত শক্ত। আলাপ করে জানা গেল, ওএতদিন আদমজী এলাকায় রিক্সা চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করেছে—শুধু নিজের নয় পরিবারেরও। এইটুকু বয়সে রিক্সা চালিয়ে দিনে গড়ে পঞ্চাশ টাকা সংসারে দিয়েছে। কিন্তু এত কষ্ট করেও সেখানে থাকতে পারলো না। পরিবারের সদস্যদের প্রতি ও দারুণ বিরক্ত। ওর বড় বোনটি মায়ের দ্বিতীয় স্বামীর সাথে পালিয়েছে। মায়ের মধ্যেও ও খুঁজে পায়না মাতৃত্ব। কি করে ও থাকে আর সেই পোড়া সংসারে। তাই ও আবার ফিরে এলো এই বাসাতে। এবার ওকে বেশ স্থিতিশীল মনে হয়। ও বলে, আমি আর ফিরে যাব না, আপনাদের এখানেই থাকবো। বোন ও খুশী মনে বলেন, তুই থাকবি—এটাই তো আমরা চাই। ও যেন আসলেই ঘরের লোকের মত থেকে গেল। ঘরে-বাইরে ও এ বাসার শত শত টাকা লেনদেন করেছে, কিন্তু এক কপর্দকও কখনো হাতিয়ে নিল না, কোন কিছু নিয়ে ভাগলোও না। এ বাসার সব কিছুই যেন ওর। তাই নিজের জিনিস নিয়ে ভাগার প্রশ্নই যে আসে না। বাসার প্রতিটি স্বার্থ রক্ষার ব্যাপারেও সে সচেতন।

আমি মাঝে মাঝে ভাবি, বাজে পরিবারের অশিক্ষিত এই ছেলেটি এতটা বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল হয়ে উঠলো কি করে? সব কিছু লক্ষ্য করে বুঝলাম, না-এ ব্যাপারে একা কারো কোন কৃতিত্ব নেই। বরং সুন্দর এ অবস্থার পেছনে লুকিয়ে রয়েছে উভয় পক্ষের কৃতিত্ব। ছেলেটির প্রতি আমার বোনের দেখেছি অগাধ বিশ্বাস ও ভালবাসা। আর ছেলেটিকেও দেখেছি তার ব্যক্তি জীবনের নানা দুর্যোগ ও দুর্ভোগের মুহূর্তে সেই বিশ্বাস ও ভালবাসার মর্যাদা রক্ষা করতে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে বোনের চাইতেও মুসাকেই আমার বেশী অবাক লেগেছে। এত প্রতিকূল পরিবেশেও এই অশিক্ষিত ছেলেটি কেমন করে রক্ষা করলো তার আত্মমর্যাদাকে? তা হলে সব মানুষই কি ইচ্ছে করলে তার মর্যাদা রক্ষা করতে পারে?

রচনা কাল ঃ ২৯ মার্চ ১৯৮৭

www.pathagar.com

বাবলীর চিঠি

'ভূত-প্রেত আক্রান্ত আমাদের ছেলেবেলা' শিরোনামে একটি চিঠি লিখেছে ধানমণ্ডীর বাবলী। পত্রিকায় প্রকাশিত উক্ত চিঠির বক্তব্য বেশ সরল কিন্তু ভঙ্গিটি দারুণ ঋজু। বাবলী লিখেছেঃ গেল সপ্তাহে একরাতে বাসায় ভূতের গল্প হচ্ছিল। আমাদের মামা এ ব্যাপারে দারুণ পারদর্শী। বেশ কয়েকটি গা ছমছম ভূতের গল্প শুনিয়েছেন তিনি। সবগুলোই নাকি তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতালব্ধ, সুতরাং অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে। তা আমরা বিশ্বাস না করলেও ছোট্ট ভাইটি যে অক্ষরে অক্ষরে বিশ্বাস করেছিল তা ওর মুখ-চোখ দেখেই বুঝেছিলাম। আর তার প্রমাণও ছোট ভাইটি দিয়েছিল মাঝরাতে। হঠাৎ সে ভূত ভূত বলে মাঝরাতে চিৎকার করে উঠেছিল। আমাদের বাসাটা বেশ বড়। সবার ঘর আলাদা। ছোট ভাইটিরও। সে ভূত ভূত বলে কান্নাকাটি আরম্ভ করার পর আমরা সবাই তাকে বোঝাতে গেলে সে গোঁ ধরলো,—ঐ ঘরে একা থাকবে না সে। কি আর করা, শেষ পর্যন্ত মা ওকে নিয়ে গেলেন তাঁদের ঘরে। বাবা-মার মাঝখানে শুয়ে ওর ভয় কাটলো। তবে এখনো ভূতের ভয় ওর পুরো যায়নি। এবং যেহেতু মা ওকে উঠিয়ে নিজেদের ঘরে নিয়ে গিয়েছিলেন সেহেতু ওর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে ভূত নিশ্চয় আছে, নইলে মা কেন তাকে অন্য ঘরে নিয়ে গেল। সমস্যাটা এখানেই। আমি এরপর বাবা-মাকে বহু বলেও বোঝাতে পারিনি। সেদিন যতই ভয় পাক না কেন ছোট ভাইটিকে ওর ঘরেই রাখা উচিত ছিল। তা হলে শেষ পর্যন্ত ও বুঝতো, আসলে ভয় ওর অমূলক। ওকে সে রাতেই বুঝিয়ে দেওয়া উচিত ছিল ভূত নেই। কিন্তু ঘটেছে তার উল্টো। মা'র নিরাপদ কোলে আশ্রয় পেয়ে সে এখন সাহস হারিয়েছে। আমার মনে হয় এ সমস্যা শুধু আমাদের বাড়ীতেই নয়, দেশের বহু পরিবারেই এ রকম ঘটনা প্রায় ঘটছে। ছোট কেউ ভূত-প্রেতের ভয় পেলেই তার ভয় না ভাঙ্গিয়ে ভয় চিরস্থায়ী করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে? ছোট-বেলায় মুরব্বীদের সৌজন্যে যে ভূতপ্রেত আমাদের মনে বাসা বাঁধছে সে ভূত-প্রেত তো বড় বয়সেও আমাদের ছেড়ে যাচ্ছে না।

www.pathagar.com

'ছোট বেলায় মুরব্বীদের সৌজন্যে যে ভূত-প্রেত আমাদের মনে বাসা বাঁধছে সে ভূত-প্রেত তো বড় বয়সেও আমাদের ছেড়ে যাচ্ছে না'—বাবলীর এই যে উক্তি তা অন্য সবার জীবনে কতটা কার্যকর জানি না, তবে আমার জীবনে আমি বাবলীর উক্তির সত্যতা খুঁজে পাই।

আমি তখন অনার্সের ছাত্র। বাবা কি একটা কাজে গিয়েছিলেন গ্রামের বাড়ীতে। খবর পেলাম বাবা অসুস্থ হয়ে গ্রামে পড়ে আছেন। খবর পেয়েই আমি নারায়ণগঞ্জ লঞ্চ ঘাটে পৌঁছলাম। কিন্তু তখন পড়ন্ত বিকেল। চাঁদপুর লাইনের লঞ্চ পেলাম না। ভিন্ন লাইনের লঞ্চে কালিপুরা যাওয়ার মনস্থ করলাম। সেখান থেকে আমাদের গ্রাম খুব বেশী দূরে নয়। যথাসময়ে কালিপুরা এসে পৌঁছলাম। কিন্তু কালিপুরা থেকে বাড়ী যাওয়ার কোন নৌকা পেলাম না। যে দু'একটি নৌকা আছে তাও উল্টো বাতাসে যেতে চাইলো না। আর নদীর সোঁ সোঁ বাতাস দেখে আমিও তেমন জোর করলাম না। সড়ক পথেই হাঁটা শুরু করলাম। সন্ধ্যার আবছা আলোয় লক্ষ্য করলাম সড়কের পাশের জমিগুলোতে বর্ষার পানি ঢুকতে শুরু করেছে। বিলের ফসলাদি তখনো পানিতে ডুবে যায়নি। সড়কের মাঝে মাঝে কাটা থাকায় হাঁটু পানি মাড়িয়েই এগুতে হলো সামনে। রাত ঘনিয়ে এলো। আকাশও অন্ধকার। এক সময় ঝির ঝির করে বৃষ্টি নামলো। কিন্তু তখন আমার মধ্যে এক রোখ চেপে গেছে। যতই অন্ধকার হোক, এই রাতে আমাকে বাড়ী পৌঁছতে হবে। কিন্তু সড়কের সবটা পথতো আর সরল নয়। মাঝে মাঝে আছে বাঁক, ঝোপ-ঝাড়। ছাড়া বাড়ি। আর এই সড়কপথ তো আমার গ্রামের দিকে যায়নি। তাই পথিমধ্যে সড়ক ছেড়ে গ্রামের পথ ধরতে হলো। সে পথ মানে কখনো কারো বাড়ীর সামনে দিয়ে, কখনো গোয়াল ঘরের পেছন দিয়ে, আবার কখনো বা বিলের মাঝ দিয়ে পানিতে ছলাৎ ছলাৎ আওয়াজ তুলে বিপদের ঝুঁকি নিয়ে এগিয়ে যাওয়া।

সব মিলিয়ে আমি তখন ভয়ঙ্কর পথ পাড়ি দিচ্ছিলাম। একটা ছাড়া-বাড়ী পাড়ি দিয়েই আমাকে নামতে হলো আবার বিলের পানিতে। হঠাৎ মনে হলো আমার পেছনে পেছনে কে যেন আসছে। কিন্তু কে আসছে? তাকাবার সাহসও হলো না। পড়ি মরি করে তখন বিলের জমি পেরুতে লাগলাম। তাড়াহুড়া করতে গিয়ে জমিতে পোঁতা কাঁটা গাছে ঠোকর

www.pathagar.com

খেলাম। গা কয়েক জায়গায় ছড়ে গেল। ডাঙ্গার নাগাল পেয়ে ছুটতে গিয়ে আবার আছড়ে পড়লাম। ভূতের ভয় যেন তখন আমাকে তাড়া করে ফিরছিল। যুক্তি-তর্ক ও জ্ঞানের ভিত্তেতে তো বহু আগেই ভূত প্রেতকে অস্বীকার করেছিলাম। কিন্তু প্রতিকূল অবস্থায় রাত্রিতে গ্রামের এই অন্ধকার পথে ছোটবেলার সেই ভূত-প্রেতগুলো সব যেন আমার কাঁধে এসে ভর করলো। সব যুক্তিতর্ক যেন তখন হার মেনে গেল। ধিকিধিকি মন নিয়ে তখন এক বাড়ীতে উঠে সাহায্য চাইলাম। বাড়ীর এক যুবক হারিকেন নিয়ে আমাকে অনেক দূর এগিয়ে দিল। এভাবে সেদিন বাড়ী পাঁছলাম।

এত রাতে আমাকে দেখে তো বাড়ীর সবাই অবাক। মুরব্বীদের কেউ কেউ বললেন। বললেনঃ এত রাতে বিল-ঝিল পেরিয়ে আসার কি কোন দরকার ছিল? পথে কারো বাড়ীতে থেকে গেলেই তো পারতি। আত্মীয় স্বজনের কি অভাব ছিল? কেউ বললেনঃ কপাল ভাল যে বিলে ভূত-প্রেতে পুঁতে রাখেনি। আমি তখন নীরবে সব বকাবকি হজম করছিলাম আর মনে মনে হাসছিলাম। আসলে বনের বাঘে নয় মনের বাঘেই আমাদের খায়। আর বিলে মানুষকে পুঁতে রাখতে ভূত-প্রেত আসে না, আসে মানুষরূপী শত্রুরাই। মানুষকে মারে মানুষই, দোষ পড়ে ভূত-প্রেতের। বাড়ীতে বসে এসব কথা মনে হলেও ভেবে অবাক হলাম, কিছুক্ষণ আগে কি তীব্রভাবেই না শৈশবের সে ভূত-প্রেতগুলো আমাকে তাড়া করে আসছিলো। বুঝতে পারলাম, মস্তিষ্ক থেকে ভূত-প্রেত তাড়াতে সক্ষম হয়েছি বটে, তবে মনে এখনো ওরা ঠিকই বাসা বেঁধে আছে।

ভূত-প্রেতে অবিশ্বাসী যে 'আমি', সে 'আমি'র এখন সংসার হয়েছে। আমি তো কখনো চাইনি আমার সন্তান ভূত-প্রেত ও অলীক কোন বস্তুর ভয়ে ছোট হয়ে থাকবে। কিন্তু প্রাত্যহিক জীবনের ঝুট-ঝামেলায় দেখছি আমার সংসারেও তা ভর করেছে। আমার শিশু কন্যাকে দুধ খাওয়াতে, ঘুম পাড়াতে গিন্নী অহরহ 'কোপ্পা'র ভয় দেখাতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। আর এই কোপ্পার ভয়ে প্রচণ্ড গরমের সময়ও রাতে আমার শিশু কন্যাটি জানালা খুলতে দেবে না। আতঙ্কভরা চোখে ওর শিশু কণ্ঠে উচ্চারিত হয়ঃ আব্বু কোপ্পা আসবে। এই কোপ্পা হলো কৃষ্ণ বসনে আবৃত জটাধারী এক ভণ্ড ফকির। ছোটবেলায় আমার গিন্নী এই কোপ্পাকে

www.pathagar.com

দারুণ ভয় করতো। আর সেই 'কোপ্পা' অস্ত্রকেই গিন্নী এখন প্রয়োগ করছে আপন সন্তানের উপর। অথচ মনোবিজ্ঞানীরা বলে গেছেন, 'নিজের ইচ্ছা শিশুর মধ্যে চরিতার্থ করতে গিয়ে শিশুকে ভয় দেখানো কোনক্রমেই উচিত নয়।' কিন্তু শিশুর আপনজন হিসেবে শিশুর বেড়ে ওঠার বিপক্ষে এই কাজটি আমরা অহরহই করে চলছি।

দৈনন্দিন জীবনে আমাদের হাজারো সমস্যা থাকবে। শিশুর প্রতিদিনের জীবনেও আমাদের মুখোমুখি হতে হবে নানা উটকো ঝামেলার। কিন্তু তাই বলে বিচার-বিবেচনা রহিত তাৎক্ষণিক সমাধানের পিছনে আমাদের ছুটলে চলবে না। কারণ তাতে করে আমাদের মানবোচিত পরিবেশ হবে বিঘ্নিত এবং শিশুর বেড়ে ওঠাও হবে বিড়ম্বিত। তাই শিশুকে সত্যিকার অর্থে গড়ে তুলতে হলে আমাদের আরো সজাগ ও সুবিবেচক হতে হবে। আর তাদের জন্য গড়ে তুলতে হবে বেড়ে ওঠার একটি সুন্দর পরিবেশ। জনৈক শিশু-বিশেষজ্ঞ উল্লেখ করেছেন: যদি শিশু নিন্দা-সমালোচনার মধ্যে বাস করে তা হলে সে শিখবে নিন্দা করতে। যদি শিশু প্রতিকুল পরিবেশে জীবন যাপন করে তা হলে সে শিখবে যুদ্ধ করতে। যদি শিশু বিদ্রূপের মধ্যে বেড়ে ওঠে, তাহলে সে শিখবে ভীরু হতে। যদি শিশু লজ্জার মধ্যে বাঁচে তবে সে নিজেকে অপরাধী ভাবতে শিখবে। যদি শিশু উৎসাহের মধে বেড়ে ওঠে, তা হলে সে আত্মবিশ্বাসী হতে শিখবে। যদি শিশু সহিষ্ণুতার পরিবেশে বাস করে, তাহলে শিখবে ধৈর্যশীল হতে। শিশু যদি প্রশংসার পরিবেশে মানুষ হয়, তা হলে সে প্রশংসা করতে শিখবে। যদি শিশু ন্যায়ের পরিবেশে বাস করে, তা হলে সে সুবিচার করতে শিখবে। যদি শিশু নিরাপত্তার মধ্যে বাস করে, তা হলে সে বিশ্বাস অর্জন করতে শিখবে। যদি শিশু অনুমোদনের সঙ্গে বাস করে, তা হলে সে নিজেকে পছন্দ করতে শিখবে। আর যদি শিশু আদর ও বন্ধুত্বের পরিবেশে বড় হয়, তা হলে সে এই পৃথিবীতে ভালবাসা খুঁজে নিতে শিখবে।

আসুন আমরা একবার আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশের দিকে তাকাই, সেখানে কি শিশুর বেড়ে ওঠার মত কাংখিত পরিবেশ বিরাজ করছে? যদি কাংখিত পরিবেশ অনুপস্থিত থাকে, তা হলে সে পরিবেশ গড়বে কারা? পারস্পরিক দোষারোপ ও নানা সীমাবদ্ধতার অজুহাত না তুলে নিজের মত করে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাওয়াটাই কি এ মুহূর্তের কর্তব্য নয়?

রচনাকাল: ২৪ আগস্ট ১৯৮৬

www.pathagar.com

জুম্মানের ক্ষুর এবং সমাজপতির দৌড়

জুম্মান। এক কিশোরের নাম। এই জুম্মানকে সবার চেনার কথা নয়। কারণ সে থাকে ঢাকার একটি নির্দিষ্ট এলাকায়। তবে তার কর্মকাণ্ড যে সব সময় সেই নির্দিষ্ট এলাকায় সীমাবদ্ধ থাকে তা নয়। কখনো কখনো তার কর্মকাণ্ড এলাকার সীমানা ডিঙিয়ে এলাকান্তরেও ছড়িয়ে পড়ে। তাই জুম্মানকে নামে না চিনলেও তার কর্মকাণ্ডের সাথে পাঠকবর্গের কারো কারো পরিচয় থাকা বিচিত্র নয়।

এই জুম্মানকে আমি বেশ কিছু দিন আগে থেকেই দেখছি। তার কাজ-কর্মের কিছু কিছু খবরও পেয়েছি। কিন্তু তেমন আমল দেইনি। 'জীবন যেখানে যেমন'—এই তত্ত্বের অনুসারী হয়ে আপন প্রবাহে তরী বেয়ে গেছি। পাঠকবর্গ প্রশ্ন করতে পারেন, আপন প্রবাহেই যখন তরী বেয়ে গেলেন, তখন আজ আবার জুম্মানের প্রসঙ্গ কেন?

তারও কারণ আছে। সেদিন পাড়ায় জুম্মান এমন এক কাণ্ড করে বসলো যে তাকে আর পাত্তা না দিয়ে পারা গেল না। শুধু আমিই নই, পাড়ার সবার মুখে মুখেই এখন জুম্মানের প্রসঙ্গ। কারণ প্রকাশ্য দিবালোকে সবার সামনে এমন দৃষ্টিগ্রাহ্য ঘটনা ঘটলে তা তো আলোচনার বিষয় না হয়ে পারে না। যেখানে জাতি হিসেবে আমরা কাজের চাইতে আলোচনাতেই বেশী তৃপ্তি পাই। তাই সেদিনের ঘটনার পরে জুম্মান সম্পর্কে কিছু আলোচনা না করলে জাতীয় চরিত্রের প্রতিই অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হয়। সে অবজ্ঞা প্রদর্শনের সাহস আমার নেই। অতএব জুম্মান প্রসঙ্গে কলম ধরাটাই আজকের কর্তব্য বলে স্থির করলাম।

তাই বলে সেদিনের ঘটনাটা এখনই তুলে ধরবো, পাঠকবর্গ যেন এমনটি মনে না করেন। না, কৌতূহলী পাঠকদের মানসিকভাবে শাস্তি দেয়ার কোন দুরভিসন্ধি আমার নেই। পাঠকদের কৌতূহলকে ষোলকলায় পূর্ণ করার অভিপ্রায়েই মূল ঘটনা বর্ণনার আগে আমার কিছুটা সময় নেয়া প্রয়োজন। আর সেই সময়টা আমি ব্যয় করবো জুম্মানদের পরিবেশ-প্রতিবেশ ও বেড়ে ওঠার সংক্ষিপ্ত বর্ণনায়।

www.pathagar.com

ডাকার আজীমপুর এলাকায় একটি পুকুর পাড়ে জুম্মানদের বাস। পুকুরটির এক পাড়ে বেশ কিছু ঝোপ-ঝাড় আছে, তারই আশ্রয়ে কোন রকমে একটি ডেরা গড়ে তুলেছে জুম্মানের মা। বেশ ক'বছর ধরেই ওরা সেখানে বাস করছে। আগে থাকতো গ্রামে। গ্রামে ভূমিহীন মানুষদের কপালে যা জোটে, ওদের ভাগ্যেও তাই জুটলো। লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও উদরের আগুনে যখন অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো, তখন ওরা পাড়ি দিল শহরে। আশা ছিল শহরে অন্ন জুটবে, জুটবে আশ্রয়। শহরে এসে রাশিরাশি ঘর-বাড়ি ও রকমারি খাবারদাবার দেখে ওদের চোখও জ্বলজ্বল করে উঠেছিল। কিন্তু অল্প ক'দিনেই টের পেল ঐ ঘরবাড়ি ও খাবার-দাবারে দাঁতবসানো খুবই কঠিন। সব কিছুই কেমন কাছে-কাছে, মনে হয় হাত বাড়ালেই পাওয়া যাবে। কিন্তু হাত বাড়াতে গেলেই মনে হয় সব মরীচিকা। ওসব দেখা যায় কিন্তু ছোঁয়া যায় না।

অবশেষে ওরা ঠাঁই নিল পুকুর পাড়ে। কিন্তু পুকুরপাড়ে ঠাঁই নিয়ে জুম্মানের মা কদিনেই টের পেল এখানে থাকা গেলেও ঠিক বাঁচা যায় না। মানুষরূপী হায়েনাগুলো রাত-বিরাতে এসে হামলা করতো জুম্মানদের ঘরে। নারীদেহের উপর ওদের যতো লোভ। মধ্যরাতের এ বিভীষিকায় শিশু জুম্মান আতংকে চিৎকার করে উঠতো। কিন্তু সে চিৎকারে ওর মা মুক্তি পেত না। বরং ও পেত দু'ঘা চড়-থাপ্পড়। কখনো বা ঘাড় ধাক্কায় হতো গৃহচ্যুত। এ ভাবেই বেড়ে উঠতে থাকে জুম্মান। দিন-রাতের হাজারো দৃশ্যের সামনে ওর বয়স বাড়ে। সেও রপ্ত করে নেয় অনেক কিছু। ইতিমধ্যে পিতৃহীন জুম্মানের কপালে জোটে আরো একটি ভাই। জুম্মানের মা ভূমিহীন ছিন্নমূল। এই মহিলাটির এখন আর মানসিক ভারসাম্য বজায় নেই। সবাই তাকে পাগলী বলেই ডাকে।

সেদিন দেখি পুকুর পাড়ে ঝোপ-ঝাড়ের আশ্রয়ে গড়ে ওঠা জুম্মানদের ডেরাটি নেই। তবে কি ওরা এখান থেকে চলে গেল? কিন্তু দৃষ্টি প্রসারিত করলে পুকুরের আরেক পাড়ে দেখতে পেলাম ওদের ডেরার কিছু সরঞ্জামাদি। কারণ জিজ্ঞেস করায় জানতে পেলামঃ এ পাড়ের ভদ্রজনদের অনেকেই চায় না জুম্মানরা এ পাড়ে থাকুক। কারণ ওদের অবস্থান নাকি এ পাড়ের পরিবেশকে দূষিত করে তুলছে। অতএব 'তোমরা উন্মূল হও।' ভদ্রজনদের ইঙ্গিতে জুম্মানরা উন্মূল হয়ে আশ্রয় নিল পুকুরের অপর

www.pathagar.com

পাড়ে। কিন্তু যে হায়েনারা ছন্নমূল মহিলাকে দূষিত করলো তাদের উৎমূলে তো কেউই এগিয়ে এলোনা। অথচ এই পুকুর পাড়েই তো হাজারো ভদ্রজনের বাস। তাদের কেউ ব্যবসায়ী, কেউ আইনবিদ, কেউবা রাজনীতিক।

পুকুর পাড়ের মাঠে তো ভদ্রজনের সমাবেশ হয়, খেলাধুলা হয়, সভা হয়। পাড়ায় সমাজসেবা এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের অনেক অনুষ্ঠানও হয়। কিন্তু জুম্মানদের কিছুই হয় না।

জুম্মানের মা তাই এখন পাগল। আর জুম্মানও বেড়ে উঠেছে নিজের মত করে। আঘাত পেতে পেতে জুম্মান এখন আঘাত-প্রুফ হয়ে গেছে। আঘাত-টাঘাতে ও এখন আর টেপে না। তাই বয়সের তুলনায় ওকে একটু বেশীই সাহসী মনে হয়। পাড়ায় ইতিমধ্যেই ও কিছু কিছু দুঃসাহসিক কাজ করে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কিন্তু সেদিনকার কাণ্ডটাই নাকি ছিল সবচাইতে মারাত্মক।

পাঠকবর্গ এবার তা হলে সেই ঘটনাটাই শুনুন। জুম্মান সেদিন পুকুর পাড়ের নিকটবর্তী এক ব্যবসায়ীর বাড়ীতে হাজির হয়। ব্যবসায়ীকে বলে আমার বিরুদ্ধে অনেক মামলা। মামলা থেকে বাঁচার জন্য আমার এখন প্রয়োজন দশ হাজার টাকা। আর সে টাকা দিতে হবে আপনাকেই এবং এই মুহূর্তেই। ব্যবসায়ী ভদ্রলোক জুম্মানের কথায় আমল দিতে চান না। জুম্মান লাগায় হুমকি, ভদ্রলোক দেন ধমকি। কিন্তু ধৈর্যধরার মত ভদ্র হয়ে তো জুম্মান গড়ে ওঠেনি। তাই হঠাৎ সে কোমড় থেকে বের করে ফেলে ক্ষুরটা। ক্ষুরের তাড়া খেয়ে প্রাণ ভয়ে ভদ্রলোক আপন ঘর থেকে বেরিয়ে যান রাস্তায়। জুম্মান তখন ক্ষুর হাতে পিছু নেয় ভদ্রলোকের। ভদ্র লোক তখন অগত্যা এক প্রতিবেশীর ঘরে আশ্রয় নিয়ে জীবন বাঁচায়।

দিন-দুপুরে অনেক লোকের সামনেই জুম্মান ব্যবসায়ী ভদ্রলোককে দৌড়ালো। কিন্তু ভদ্রলোককে বাঁচাতে ভদ্রজনের কেউ এলো না এগিয়ে, যেমনি জুম্মানের মাকে বাঁচাতে কেউ আসেনি। জুম্মান তার অভিজ্ঞতায় বুঝতে পেরেছে, এখানে কেউ কাউকে বাঁচাতে আসবে না। সবাইকে বাঁচতে হবে নিজের শক্তিতেই। জুম্মান এখন তাই কাউকে তোয়াক্কা করে না। কারণ তার আছে ক্ষুরের শক্তি।

আমাদের এই সভ্য সমাজের যারা সমাজপতি, তাদের কাছে জুম্মান-

www.pathagar.com

দের কোন কদর না থাকলেও ওদের ক্ষুরের কদর আছে ঠিকই। তাই এই সমাজপতিরাই জুম্মানদের ক্ষুরের শক্তি নেয় ভাড়া করে। এই ক্ষুর কখনো কাজে লাগায় প্রতিপক্ষকে জব্দ করতে, কখনো বা হীন কোন স্বার্থ আদায়ে। এমনকি জাতীয় রাজনীতি এবং নির্বাচনেও এই ক্ষুরের এস্তেমাল হয় দারুন ভাবে। এতকিছুর সাক্ষী থাকার পরও যদি সমাজপতিদের কেউ জুম্মানদের ভাল হওয়ার উপদেশ দেন, তখন জুম্মানরা কি অট্টহাসি না দিয়ে পারে?

আসলে সমাজপতিদের স্ববিরোধী উপদেশে জুম্মানরা ভাল হবে না। আর জুম্মানরা ভাল না হলে, জুম্মানদের সর্বনাশা কাণ্ড থেকেও আমাদের বাঁচোয়া নেই।

জুম্মানদের সর্বনাশা কাণ্ড থেকে বাঁচতে হলে জুম্মানদেরও বাঁচতে দিতে হবে। আর জুম্মানদের বাঁচতে দেয়ার কাজটা কঠিন নয়। কারণ ওদের চাহিদা খুবই কম।

সমাজ সচেতন ব্যক্তিদেরই এখন সিদ্ধান্ত নিতে হবে, তারা কোন ধরনের জুম্মানদের চান। বাঁচার আশায় কাতর সেই 'কর্মী জুম্মান' এবং ক্ষুর হাতে দণ্ডায়মান 'দস্যু জুম্মান'—দুই-ই আপনাদের হাতের নাগালে।

রচনাকাল ঃ ৬ মে ১৯৮৬

শেষ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

তার লেখার সাথে আমার পরিচয় দীর্ঘদিনের। 'কালের কথা'য় লেখক সমকালীন ঘটনা প্রবাহের সাথে সঙ্গতি রেখে এই মনোরম পাণ্ডুলিপি তৈরী করেছেন। বইটি যে আমাদের মননশীল পাঠকদের নতুন চিন্তার খোরাক দেবে এতে আমার এতটুকু সন্দেহ নেই। কালের কথার প্রবন্ধগুলো পড়ে আমার মনে হয়েছে, এই লেখকের চিন্তা ও বিশ্লেষণ শক্তির একটা পরিচ্ছন্ন ধারাবাহিকতা আছে। তার আদর্শবাদও স্পষ্ট। তিনি বিশ্বাসী মানুষ। সমাজের প্রতি তার যে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী রয়েছে তা ব্যক্তি মানুষের আলোচনায়ও দরদপূর্ণ বিবরণ হয়ে উঠেছে। এ ধরনের দয়ার্দ্রচিত্ত লেখকগণই শেষ পর্যন্ত চিন্তার ক্ষেত্রে স্থায়ী প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হন। জয়নুল আবেদীন আজাদের রচনাকে এ কারণেই আমি সার্থক এবং আমার জন্য অবশ্য পাঠ্য বলে বিবেচনা করি।

আবদুল মাহমুদ